উদ্যোগ পত্রিকা

Scanned by CamScanner

বিংশতি বর্ষ—প্রথম সংখ্যা
জানুয়াবি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ-২০১৮

ডি. এল. নং—৫৮

উদ্ভাস পত্রিকা

সম্পাদক: কাবেরী ঠাকুর
প্রকাশক: জয়শ্রী কুন্ডু
প্রচ্ছদ: ঝন্টু নায়েক
অলংকরণ: রমেশ দাস ও ঝন্টু নায়েক

সম্পাদকের দপ্তর

১১০/২১ বি, সেলিমপুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১

Scanned by CamScanner

সূচি

উদ্ভাস		৩
আমাদের কথা		৪
আমার প্রিয় ময়না	রূপসা সরদার	৫
আমার বাগান	সুমিত্রা দাস	৬
বদমাস	বন্দনা	৭
বারুইপুরে পিকনিক	অর্ণব বসু	৮
টিঙ্কুর পাখির খাঁচা	সমাদৃতা রায়	৯
বাদাবনের পিশাচ ও কুমির ভূত	চন্দ্রা কর	১১
ভুলো	শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৩
কুড়ি	রীতা আঢ্য	১৪
জলদাপাড়া জঙ্গলে	সমীরকুমার রায়	১৬
ব্রতচারী গ্রাম ও গুরুসদয় দত্ত	তপতী মিত্র	১৯
মনমাতানো মসলিন	সর্বাণী মুখার্জী	২২
ধাঁধা		২৩
জানা অজানা	জানকী	২৪
শব্দবাক্স		২৬
হারিয়ে গেছে যে সব খেলা	সুনেত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
জানো কি?	ত্রিনয়ন ঘোষ	৩১
পূর্ব সিকিমে পাঁচ দিন	মানসকুমার আঢ্য	৩২
গোয়েন্দা তোজো	শুচিস্মিতা দেব	৩৬
অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল	সুকমল ঘোষ	৪১
সেবারের দোলের দিনটা	কাবেরী ঠাকুর	৪৪

Scanned by CamScanner

উদ্ভাস

'উদ্ভাস' সংস্থাটি তৈরি হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি। সে সময় ঢাকুরিয়া লেকের মাঠে (রবীন্দ্র সরোবর) ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত সময়টা কাটাতেন কয়েকজন অভিভাবিকা। আশে পাশেই দুঃস্থ মানুষের ঘন বসতি। সেখানকার শিশুদের শৈশব নেই, শিক্ষা নেই, সুষম আহার নেই। আছে শুধু লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অনাহার আর অপুষ্টি। অভিভাবকদের নিছক আড্ডা গল্পের মাঝখানেই এদের আনাগোনা। এক সুপ্ত অপরাধবোধ থেকেই বোধ হয় সেদিন অবহেলিত শিশুদের কল্যাণে কিছু করার ভাবনা শুরু হয়। আর সেই ভাবনারই ফলশ্রুতি 'উদ্ভাস' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা—সমাজের অন্ধকারের প্রকোষ্ঠগুলিতে আলোর সন্ধান এনে দেবার এক প্রয়াস।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে উদ্ভাস—সরকারি সাহায্যের বাইরে গড়ে ওঠা একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটা গর্বের কথা। কিন্তু অতৃপ্তি তো রয়েই গেছে—যা চাওয়া হয়েছিল তার কতটুকু সফল হলো!

লেকের মাঠ ছেড়ে 'উদ্ভাস' এর দৈনন্দিন কাজকর্মের জায়গা আয়কর ভবনের (দক্ষিণের) গাড়ি রাখার স্থানটি। স্থায়ী আস্তানা শেষ অবধি জুটেছে রহিম ওস্তাগর রোডে। শুভার্থীদের সাহায্য আর শুভেচ্ছাতেই এটি সম্ভব হয়েছে। আর সেই কারণেই এখনও চলছে ছেলেমেয়েদের বিনা মুল্যে পাঠদান, নাচগান, সেলাই, ফুটবল খেলা আর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। বছর জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা — নাট্যাভিনয় থেকে শুরু করে রক্তদান শিবিরও।

উদ্ভাসের ক্লাস শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটায়, শেষ হয় দশটায়, শনিবার বন্ধ থাকে। নতুন আস্তানায় একটি হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও চলছে। চলছে বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করার চেষ্টা।

স্বেচ্ছাসেবীদের নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টায় আর শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ও শুভেচ্ছা সম্বল করে আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে চায় 'উদ্ভাস'।

Scanned by CamScanner

আমাদের কথা

নতুন বছর ২০১৮ তে এই প্রথম তোমাদের সঙ্গে কথা বলা। বছরের শুরুতে শীতটা কদিন বেশ ভালোই দাপট দেখিয়ে গেলো, কি বলো! জাঁকিয়ে শীত পড়লো যে কটা দিন, তোমাদের তো তখন ভারি মজা। রঙবেরঙের গরম জামা গায়ে দিয়ে, পিকনিক করে আর বেড়িয়ে বেড়িয়ে, কমলালেবু, জয়নগরের মোয়া খেতে খেতে শীতের কাঁপুনি টেরই পেলে না। আর আমাদের অবস্থাটা ভেবে দেখো তো—হাড়গুলো সব ঠকঠক করে কাঁপছে। ব্যথা যে শরীরের কোথায় নেই সেটা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। তবু, বলতেই হবে, শীতের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে বেশ লেগেছে। গাজরের হালুযা, নলেন গুড়ের পায়েস, রাঙালুর পান্তুয়া, পাটিসাপটা, কড়াইশুঁটির কচুরি এসব খাবো না খাবো না করেও খেয়ে ফেলেছি। আর তোমরা তো খাবেই—এখনই তো তোমরা আনন্দ করবে মনের সাধ মিটিয়ে।

তোমাদের এখন কতো কী আছে। আমরা তো বড়ো হয়েও তা হাতে পাইনি। টিভি, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন, কমপিউটার, ফেসবুক, টুইটার আরও সব কত কী! একটা হাতঘড়ি পেলেই নিজেকে মনে হতো বিরাট কিছু হয়ে গেছি। আর তাই তখন অল্পেতেই আমরা খুশি হতাম। তখন রাস্তাঘাটে বিশেষ করে শীত কালে এতো দূষণ ছিল না। রাস্তায় নাকে মুখোশ লাগানো লোক কখনও দেখেছি বলে মনেই পড়ে না, গাড়িতে গাড়িতে রেষারেষি, পথের নিয়ম না মেনে চলার ঘটনা এসব ঘটতো কখনও সখনও। কিন্তু এখন তো এসব ঘটনা সকলেরই গা সওয়া হয়ে গেছে। তা নাহলে ভাবতে পারা যায়, ড্রাইভার এক হাতে মোবাইল কানে ধরে আছে আর এক হাতে বাস চালাচ্ছে—আর তারপর গাড়ি পড়লো সেতু ভেঙে জলে। কত জনের প্রাণ গেলো তার ঠিক হিসেব এখনও মেলেনি। অনেক বাচ্চা ছেলেমেয়ের জীবন চলে গেলো। এই অপরাধের কি কোনও ক্ষমা আছে? আর বাচ্চাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচারের ঘটনা তো ঘটেই চলেছে। তোমরা কিন্তু সাবধানে মোবাইল ফোন, সেলফি এসব ব্যবহার কোর। বিজ্ঞানের দানকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে জীবনকে আরও ভালোভাবে আর আনন্দে কাটানো যায়। কিন্তু বেঠিকভাবে ব্যবহার করলেই এই বিজ্ঞানই চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে।

পত্রিকা যখন হাতে পাবে ততদিনে শুরু হয়ে যাবে বসন্তকাল। এখন অবশ্য বসন্ত কালকে আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রকৃতিও যেন গ্রীষ্ম আর শীত এই দুটো ঋতুই পাঠায়। তাও আবার গ্রীষ্মের দিনগুলোই অনেক বেশি। ভালো থেকো তোমরা। প্রতিটি দিন ভালোভাবে কাজে লাগিও।

Scanned by CamScanner

আমার প্রিয় ময়না

রূপসা সরদার

স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি রাস্তায় একটা পাখির ছোট্ট ছানা পড়ে আছে। ডিম ফেটে ছানাটি বের হয়ে কিচির মিচির করছে। আমার দেখে খুব মায়া হল। তাই আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। মা দেখেই বললেন, এটা নির্ঘাত ময়না। আমি তাই শুনে ওই ছোট্ট ছানাটির নাম রাখলাম মিঠু। মিঠুকে আমি প্রতিদিন দানা খাওয়াতাম। মিঠুর চোখ ফুটলো। ধীরে ধীরে মিঠু আরো বড়ো হলো। একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো সেদিন। সেদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না। মা রান্না করছে। বাবা কাজে গেছে। মিঠু ওপরে একা ছিল, দমকা হাওয়ায় ঘরের জানলাটা খুলে গেছিল। এই সুযোগে একটি হুলো বিড়াল ঢুকে গেছিল জানলা দিয়ে। সে মিঠুকে খাওয়ার চেষ্টা করছিল। এই সময় আমি এসে পড়েছি, এইসব কান্ড দেখে আমি মা মা বলে চেঁচিয়ে উঠেছি। মা এসে তাড়াতাড়ি একটা লাঠি এনে বিড়ালটাকে তাড়ালো। আমিও বাঁচলাম। মিঠুও বাঁচলো। আমি একদিন শুয়ে শুয়ে ভাবছি, মানুষ তো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। পাখিরা তো উড়ে বেড়ায়। আমার মিঠু তো শুধু ওই খাঁচার ভিতর থাকে সবসময়। ওরও তো খুব কষ্ট হয় তাহলে! তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, মিঠুকে আর বাড়িতে রাখা যাবে না। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন। আমার মাও মিঠুকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। মা বললে, তুই ওকে ছেড়ে থাকতে পারবি? আমি বললাম, ঠিক পারবো মা। আমি ছুটে চলে গেলাম ওপরে। জানলাটা খুলে মিঠুকে উড়িয়ে দিলাম। আমার প্রিয় পোষাপাখি উড়ে গেলো আকাশে।

(রূপসা উল্লাস-এ পড়ে। ক্লাস সিক্স। ছোট্ট পাখির ছানাকে যত্ন করে বড় করে তারপর খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছে। খুব ভাল কাজ। নিজের জায়গা ছেড়ে কেউই মনের আনন্দে থাকে না, তা তুমি যতই আদর যত্ন করো তা তাকে। পাখি পুষে চিরদিন খাঁচায় বন্দি করে রাখা মোটেই ঠিক কাজ নয়। আরও লেখা পাঠিও।)

আমার বাগান

সুমিত্রা দাস

শীতের দিনে বাগান আমার
ফুলে ফুলে ভরে
গোলাপ গাঁদা ডালিয়ারা
চোখের নজর কাড়ে
যেমন তাদের রঙের বাহার
তেমনি তাদের গন্ধ
দেখে দেখেও আশ মেটে না
মনভরা আনন্দ
ফুলেরা সব বলে, তোমার
বন্ধুরা সব কোথায়?
আসতে বলো, তাদের সাথে
করবো পরিচয়
তোমরা, আমার বন্ধুরা সব
বাগান দেখে যেও
ফুলগুলো সব থাকতে থাকতে
পদধূলি দিও।

[বাহ্‌, বেশ লিখেছো কবিতাটা সুমিত্রা। তোমার লেখা পড়ে আমারই ইচ্ছে করছে তোমার বাগানটা একবার দেখে আসি। আসলে তুমি ক্যানিং-এ থাকো তো, আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে-তাই যাওয়া বোধ হয় হবে না। তুমি কিন্তু বাগান করাটা শীতকাল চলে গেলে আবার বন্ধ করে দিও না যেন। সুমিত্রা এখন ক্লাস এইটে পড়ে।]

Scanned by CamScanner

বদমাস (BODMAS)

বন্দনা

বিতান ও দানিশের ছোটবেলা থেকেই খুব বন্ধুত্ব। দুজনে একই ক্লাসে পড়ে— পড়াশোনায় দু'জনেই বেশ ভালো এবং দু'জনেই অঙ্ক কষতে বেশ ভালোবাসে।

অঙ্ক বিষয়টা সব ছেলেমেয়েরা কষতে ভয় পায় কারণ ঠিক মতো পদ্ধতিটা জানে না বলে। একদিন দুই বন্ধুতে সরল অঙ্ক কষতে বসেছে কিন্তু দু'জনেই সরলের উত্তরগুলো মেলাতে পারছে না—(অঙ্ক বই এর শেষের দিকে পেছনের পাতাগুলোতে উত্তরমালা দেওয়া থাকে প্রতিটি অঙ্কের) অথচ ওরা দুজনেই অঙ্কে বেশ ভালো।

দুই বন্ধুরই মাথায় হাত। ঐ সময় দানিশের দাদা পাপন যে বেশ জিনিয়াস এবং অঙ্কেও তুখোড় সে দু'জনকে চিন্তিত দেখে জানতে চাইল কারণটা। তখন জানার পর পাপনদা বলল সরল করার সময় BODMAS কথাটা মনে রাখতে।

(B) প্রথমে ব্র্যাকেট প্রথমে 3rd পরে 2nd তারপর 1st তারপর এর (0)

(D) Division ভাগের কাজ তারপর (M) Multiplication গুণের তারপর (A) Addition যোগের কাজ (S) Subtraction তারপর বিয়োগের কাজ করলেই কেল্লা ফতে—

বিতান ও দানিশ এই পদ্ধতিতে পটাপট সব সরলগুলো করে ফেললো—বেশির ভাগ সরলের উত্তর হয় ১।

দুই বন্ধুর মুখের অনাবিল হাসি পাপনদার পুরস্কার।

[বন্দনার আসল নাম স্বপ্না দাস। বন্দনা ছদ্মনামেই ও লিখতে ভালোবাসে। তোমরাও 'বদমাস' ফর্মুলা কাজে লাবিয়ে সরল অঙ্কগুলো চটপট করে ফেলতে পারো।]

Scanned by CamScanner

বারুইপুরে পিকনিক

অর্ণব বসু

এবারে আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম বারুইপুরে। আমার মামার একটা বাগানবাড়ি আছে সেখানে। সকালবেলায় দুটো গাড়ি নিয়ে আমরা বারোজন গিয়েছিলাম। দশটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। দোতলা বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। আর একটু ফাঁকা জায়গা। গাড়ি থেকে নেমেই আমাদের জলখাবার দেওয়া হল কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম আর মিষ্টি। তারপর আমরা ছোটরা খেলা শুরু করলাম ক্রিকেট খেলা, ব্যাডমিনটন খেলা। বড়রা মিউজিক্যাল চেয়ার খেললো। সেদিনটা খুব সুন্দর ছিল। ঠান্ডা ছিল রোদও ছিল। অনেক ছবি তোলা হল। এর ফাঁকে চা কফি পকোড়া দেওয়া হল। মাকে না জানিয়ে আমি দু কাপ কফি খেয়েছি। এই যে লিখছি এখনও পর্যন্ত মা জানে না আমি দুকাপ কফি খেয়েছি। জানতে পারলে দেবে মার। বেলা একটার সময় ফ্রায়েড রাইস মাংস কপির তরকারি ফ্রাই চাটনি দেওয়া হল। রান্না মোটেই আহামরি নয় তবে খেতে তো হবে তাই খেলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরোলাম। দেখলাম পুকুরে কতগুলো ছেলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কাটছে। কিছু বাড়িতে দেখলাম লাউ লেবু লঙ্কা পেঁপে ফলে আছে। আমি একটা লেবু তুলতে যেতেই এক বুড়ি রেরে করে তেড়ে এল। আমরা পালালাম। বিকেল হয়ে এল। এবার ফেরার পালা। এবার আর কফি খাইনি, মা কাছে পিঠে ছিল। সন্ধে সাতটায় বাড়ি ফিরেছি। বাড়ি ফিরে শুনলাম মা বাবাকে বলছে মামা নাকি বাগানবাড়িটা বিক্রি করে দেবে। আর চালাতে পারছে না। শুনে আমার দুঃখ হল। বড় হয়ে চাকরি করে আমি এরকম একটা বাড়ি কিনবো।

[অর্ণবের পিকনিকের খাওয়ায় মন ভরেনি। ঠিক আছে। বড়ো হয়ে তুমি নিজে যখন পিকনিক এর বন্দোবস্ত করবে তখন ভালো রান্না করা খাবারের আয়োজন কোর। সবচেয়ে ভালো হয় পিকনিকটা যদি তোমার নিজের কেনা বাগান বাড়িটাতে হয়। অর্ণব ঢাকুরিয়ায় থাকে, ক্লাস এইটের ছাত্র।]

Scanned by CamScanner

টিঙ্কুর পাখির খাঁচা

সমাদৃতা রায়

আমি টিঙ্কুর পাখির খাঁচা। আমায় কুমারটুলির লোহার কারখানায় তৈরি করা হয়েছিল। সে যে কতদিন আগের কথা। এখন আমার বয়স পঞ্চাশেরও ওপরে। লোহার রডগুলোয় জং ধরে গেছে। টিঙ্কু আমায় তাদের খোলা বারান্দার ছাতে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমার মধ্যে বন্দি আছে একটা টিয়া, নাম তার রবার্ট। দুজনে কেউ কারুর ভাষা বুঝতাম না। কিন্তু আবার ইঙ্গিতে মনের অনুভূতি ভাগ করে নিতাম।

আমি বুঝতাম রবার্টের খোলা আকাশে উড়ে যেতে মন আনচান করছে। চারদিকে ঘেরা এই ছোট্ট খাঁচার মধ্যে ডানা মেলতে না পেরে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসত।

বারান্দা থেকে আমি রোজ দেখি পাখির দল সকালবেলা উড়ে যায়। আবার দিনের শেষে কিচমিচ করতে করতে বাসায় ফিরে আসে। আমার মনে হয় ওরা যেন কেউ নিজেদের মধ্যে সারাদিনের গল্প করছে কেউ বা কিচ্‌কিচ্‌ করে যেন নিজেদের ছানাদের খবর দিচ্ছে। যখনই পাখিদের কিচ্‌কিচ্‌ রবার্ট শোনে তখনই সে আমার রেলিংগুলোতে ঠোক্কর মারতে থাকে আর জোরে জোরে পাখা ঝাপটায়। রবার্ট ঠোকরালে আমার ব্যথা লাগে কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে ও মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব করছে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে রবার্ট যেন স্বাধীনতা পায়।

একদিন টিঙ্কুর মামা দীপঙ্করবাবু বেড়াতে এলেন। তিনি টিঙ্কুর জন্য একটা নতুন রেলগাড়ি খেলনা কিনে এনেছিলেন। বাড়ির সবাইয়ের কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে দীপঙ্করবাবু পাখিদের নিয়ে পড়াশুনা করেন। আমার মনে হল হয়তো তিনি রবার্টকে ছেড়ে দিতে বলবেন। কিন্তু টিঙ্কু তার নতুন খেলনা রেলগাড়ি নিয়ে এতই মগ্ন ছিল যে সে রবার্টের কথা ভুলে গেল। টিঙ্কুর মা বাবারাও হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে রবার্টের কথা ভুলেই গেল। আমার মন থেকে আশার আলো নিভে যেতে লাগল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মামা যখন বেরিয়ে যাবেন তখন টিঙ্কু তার মামাকে ছুটে এসে রবার্টের কথা বলল। তার মামাকে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে এল। মামা যেন আমার ইচ্ছাটা বুঝে নিলেন। তিনি টিঙ্কুকে পাখিটাকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বললেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর টিঙ্কু এক ছুটে একটা বড় জং ধরা চাবি নিয়ে এসে আমার খাঁচার দরজা খুলে দিল। রবার্ট আমায় যেন দুঃখ ও খুশি ভরা চোখে বিদায় জানাল। আমাকে মাঝে মাঝে ঠোকরালেও আমাদের মধ্যে

Scanned by CamScanner

কিছুটা ভাবও হয়েছিল। দুজনে কথা বলতাম। এখন থেকে আমি একা থাকবো। হয়তো টিঙ্কু আমাকে ফেলে দেবে কিন্তু আমি জানবো যে নিজের বিশ্বাসের জোরে একটা বন্দি টিয়াকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে পেরেছি।

[সমাদৃতা, খেলায় হ্যাট্রিক হয়, তুমি লেখায় হ্যাট্রিক করলে—মানে পরপর তিনটে সংখ্যায় লেখা পাঠালে। খুব ভালো। লিখে যাও। সমাদৃতার ক্লাস ফাইভ চলছে।]

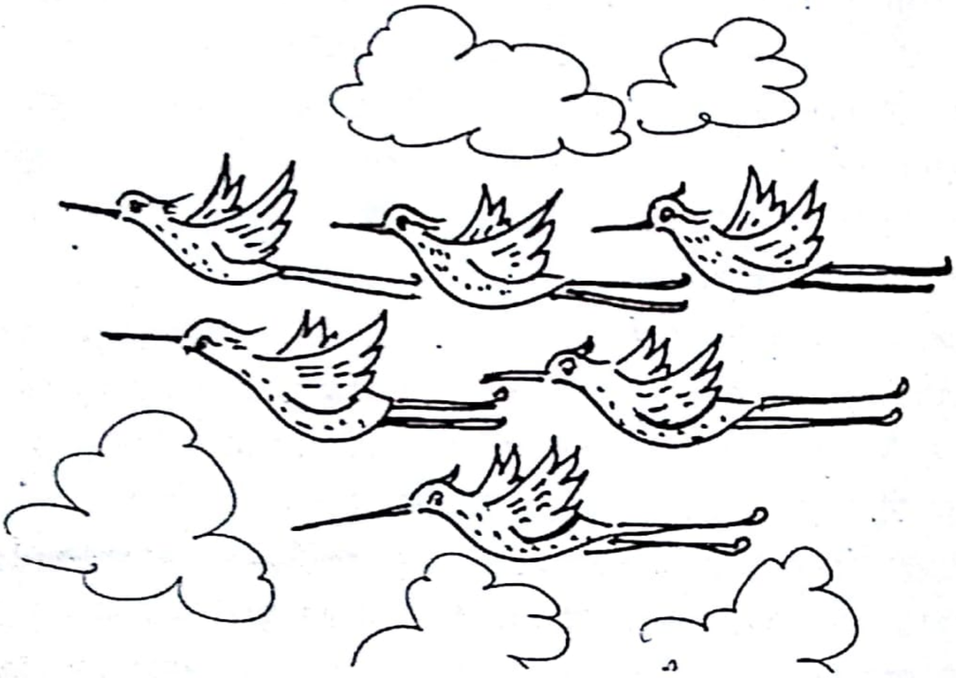

বাদাবনের পিশাচ ও কুমির ভুত

চন্দ্রা কর

বাদাবনের গভীর জলের ধারে ছোটো এক গ্রাম। অল্প কিছু লোকের বাস সেখানে। সকলেই খুব গরিব। জলেই এদের জীবন, রুটি-রুজি। মাছ ধরে ও জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে শহরে-বাজারে বিক্রি করে যা পয়সা পায় তাই দিয়ে চাল-ডাল-তেল-নুন কিনে ঘরে ফেরে তারা। এরকমই একভাবে দিন কাটে তাদের জলে কুমির ও ডাঙায় বাঘ-সাপের সঙ্গে। একদিন একজন গরিব লোক মাছ ধরতে গেলো নদীতে। যখন মাছ ধরে ফিরছে সে

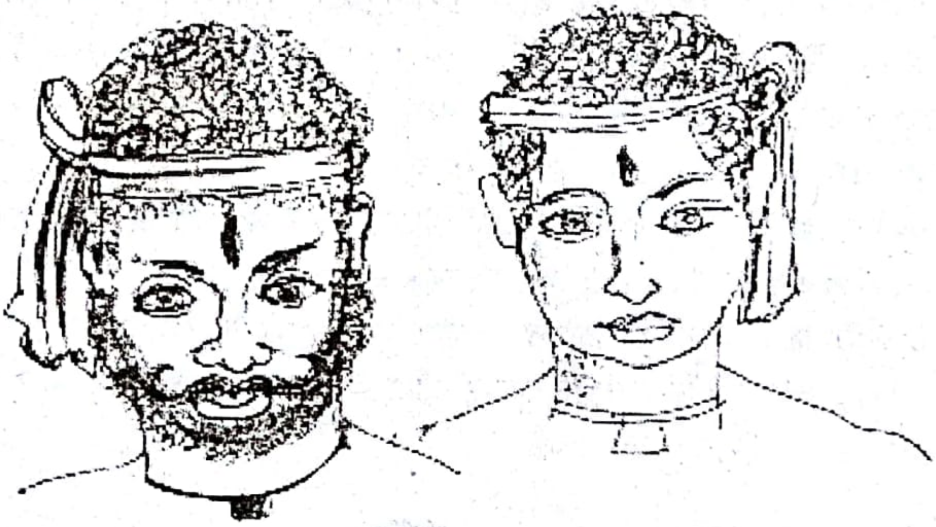

তখন হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেলো, শোঁ-শোঁ বাতাস বইলো—ঝড় উঠলো খুব। আর তার ছোট্ট ডিঙি গেলো ডুবে। মাছের মতোই সাঁতার জানে এরা; তাই মাছধরা হাঁড়ি মাথায় নিয়েই সাঁতরে চললো সে পাড়ের দিকে। প্রায় যখন এসে গেছে এমন সময় একটা কুমির তাকে আক্রমণ করলো। সেও প্রাণপণে কুমিরের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। হাতে ছিল কাটারি। তাই দিয়ে কুমিরের গলায় কোপ দিয়ে ঘায়েল করে নিজেও ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ঘরে ফিরলো। গোল পাতায় ছাওয়া ছিটেবেড়ার ঘরে অসুস্থ মানুষটি শুয়ে থাকে। সামান্য টোটকা চিকিৎসা করিয়েছে তার বৌ। চলতে পারে না সে এখন একদম। তাই তার

Scanned by CamScanner

বৌ যায় মাছ ধরতে আর গেঁড়ি-গুগলি-শাকপাতা তুলে হাটে বেচতে। এরকমই একদিন বৌ গেছে হাটে আর লোকটি ঘরে শুয়ে-শুয়ে তার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবছে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে; এমন সময় হঠাৎ তার মনে হলো অন্ধকারে তার পায়ে কী যেন সুড়-সুড় করছে। সাপ ভেবে সে প্রথমে পা ছুঁড়তে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না—ভীষণ ভারি হয়ে গেছে তার পা দুটি। তখন হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা লাঠি দিয়েই মারলো পায়ের দিকের অন্ধকারে। একটা ঝটপট শব্দ হলো আর কালো আঁধারে আরো কালো জমাট বাঁধা কোনও একটা জন্তু বিশাল ল্যাজ আছড়ে পালিয়ে গেলো। ঠিক যে রকম কুমিরটাকে সে মেরেছিল ঐ রকম। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে পায়ে হাত বুলিয়ে দেখলো কী সর্বনাশ! তার পায়ের পাতাটার আধখানা যে নেই। চলতে তো আর পারে না—কাজেই শুয়েই থাকে। কিন্তু যখনই তার বৌ হাটে যায় আর ফিরতে সন্ধে হয়—তখনই সেই ঝটপট শব্দে অদৃশ্য আগন্তুক এসে তার পায়ের উপর পড়ে ও লাঠির আঘাত পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর লোকটি দেখে তার পায়ের পাতাটির বাকি অর্ধেকও নেই। এভাবেই ক্রমশ তার পা হাঁটু পর্যন্ত নেই হয়ে গেলো। তারপর একদিন লোকটির মৃত্যু হলো।

বহুদিন কেটে গেছে। কিন্তু এখনো ঐ গাঁয়ের মানুষ সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই দেখতে পায় জলের ধারে এক আঁধার কালো লোকের সঙ্গে একটা কুমিরের ঘোর যুদ্ধ হচ্ছে। লোকটির হাতে একটা কাটারি আর সে প্রাণপণে কোপ দিচ্ছে কুমিরটার গলায়। অবশেষে কুমিরটা জলে পড়ে গেলো আর লোকটি কালো আঁধারে বাদার জঙ্গলে মস্ত ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেলো।

Scanned by CamScanner

ভুলো

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

হাঁক ডাক নেই আর
কেন মোর ভুলোটার
জানলাম বুদ্ধিটা ঘেঁটে!
ভুল করে দুই দিন
গঁদ খেলো একটিন
তাই গেছে মুখখানা এঁটে।।

সত্যি

ট্রেনে উঠলে পড়ছে ডাকাত
ট্রামে বাসে পকেটমার
রাস্তাঘাটে ছিনতাই বাজ
সুযোগ কোথায় পথচলার।।

সাবধান

বাইরে যাবার আগে দিদি
গয়না খুলে যান,
নথ পরলে নাকটা যাবে
দুল পরলে কান!

আফশোস

আলমারিতে কত বাড়িতে
রয়েছে কত বই
ধুলোয়, পোকায় সব নষ্ট
পড়বার লোক কই!

Scanned by CamScanner

কুড়ি

রীতা আঢ্য

তোমরা সুজিকে চেনো তো? কি করেই বা চিনবে? ওর পুরো নাম সুজাতা, আমার ছোটো মাসির মেয়ে। ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আজ স্কুল থেকে ফেরার সময় কোথা থেকে একটা টিয়া পাখির বাচ্চা হাতে করে নিয়ে এসেছে।

ব্যাস, বাড়িতে ঢোকার পর সবাই হামলে পড়লো, কোথায় পেলি, কেমন করে পেলি, হাজারো প্রশ্ন। ঐ দিন আমি মাসির বাড়িতে কী কারণে উপস্থিত ছিলাম ঠিক মনে নেই। সুজি আমাকে খুব ভালোবাসতো। সে সোজা আমার কাছে পাখিটা নিয়ে এলো আর বললো,—স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখি গাছ থেকে পাখিটা পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ওকে বাড়ি নিয়ে এসেছি।

পশুপাখির প্রতি সুজির মায়া মমতা ছোটোবেলা থেকেই একটু বেশি। সুজি বললো, —দিদিভাই, পাখির বাচ্চাটাকে বাঁচাও প্লিজ।

—দেখলাম পাখিটার খুবই করুণ অবস্থা। ভাল করে শরীরে পালকও গজায় নি, চোখটা বোজা, মনে হচ্ছে মরেই গেছে। এর মধ্যে মাসি বললো—দেখি তোরা একটু সরতো, —বলে একটু জল মুখের মধ্যে ঠোঁট ফাঁক করে দিলো। তারপর একটু আটা গুলে খাওয়ানো হলো। পাখিটা সুস্থ হলো। এইভাবেই চলতে লাগলো।

যাই হোক, টিয়ার বাচ্চাটা কিন্তু বেঁচে গেলো। সবাই খুব খুশি। সন্ধেবেলায় মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে দেখে বললো,—তোমরা সবাই মিলে একটা প্রাণ বাঁচিয়েছ, এর থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে? একটু বড়ো হোক, একটা খাঁচা এনে দেবো।

পরিবারে একজন সদস্য বাড়লো। আপাতত পাখিটাকে একটা জুতোর বাক্সে রাখা হলো।

এবার আমি মাসিকে বললাম—আমি এবার আসি। মাসি বললো—কিছু খেয়ে যা। বিকেল থেকে তো পাখি পাখি করে কারুরই কিছু খাওয়া হয়নি।

আমি বললাম—না দেরি হয়ে যাবে, আমি আজ আসি।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেলো। ফোনে অবশ্য সব খবর দেওয়া নেওয়া হতো। এর মধ্যে একদিন সুজি ফোন করে বললো—দিদিভাই, একদিন এসে দেখে যেও কুড়ি কতো বড়ো হয়েছে। রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল বলে সুজি ওর নাম রেখেছে কুড়ি। মেসোমশাই একটা বড়ো খাঁচা এনে দিয়েছে, তার দাঁড়ের উপর বসে এপাশ ওপাশ করে।

Scanned by CamScanner

সারা শরীর সবুজ পালকে ঢেকে গিয়েছে। ঠোঁটটা টুকটুকে লাল, গলার কাছে একটা লাল রেখা। ছোলা, কলা, পাকা লঙ্কা, পাকা ফল সবই খায়। আবার কথা বলতে শিখেছে। সুজিকে ডাকে সুজি সুজি বলে। সুজি ওকে ডাকলে ও সাড়া দেয়। দরজায় বেল বাজলে বলে 'কে?' বাড়িতে লোক এলে বলে, 'কে এসেছে? কে এসেছে?' সুজি স্কুল থেকে ফিরলে বলে, 'সুজি, খেয়ে নে।' আসলে মাসি যা যা বলে, তাই বলার চেষ্টা করে। এসব দেখে শুনে আমারও খুব ভালো লাগতো।

সেদিন বিকেল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। সদর দরজা বন্ধ, সবাই বাড়িতে—দিনটা ছিল রবিবার। কিন্তু পাখিটা বারবার বলছে, 'কে এসেছে, কে এসেছে?' মাসি বলছে, 'কেউ আসেনি, চুপ কর, চুপ কর'। কিন্তু কুড়ি বলেই চলেছে, আর খাঁচার ভিতর এপাশ ওপাশ করছে। বাড়ির সবাই বিরক্ত হচ্ছিল, কেউই ওর কথায় পাত্তা দিচ্ছিল না।

দেখতে দেখতে রাত হলো, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। পাখির খাঁচাটা বারান্দায় ঝোলানো থাকতো। বৃষ্টি দেখে মাসি খাঁচাটাকে বারান্দার এক কোনায় নামিয়ে রেখে দিয়েছিলেন।

মেসোর আবার খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। সকালে উঠে মর্নিংওয়াক করতে বেরোন। মেসোর ঘুম ভাঙতেই উনি চিৎকার করে উঠলেন—ওঠো ওঠো, দেখো ঘরের দরজা খোলা, আলমারি হাট করে খোলা।

মাসি উঠেই দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে খাঁচার ভিতর পাখিটা মরে পড়ে আছে, খাঁচার দরজাটা খোলা। ওদের আর বুঝতে অসুবিধা হলো না কুড়ি কেন সন্ধে থেকে বলছিল, "কে এসেছে? কে এসেছে?"

আসলে সবার অলক্ষে একটা চোর বাড়ির ভিতর ঢুকে শোওয়ার ঘরের খাটের নিচেয় লুকিয়ে ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর সে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় কুড়িকে মেরে রেখে চলে গেছে।

বাড়িতে কান্নাকাটি, চ্যাঁচামেচি, থানা পুলিশ সব কিছু হলো। সবার মন খুব খারাপ। সুজি কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে ভালো করে কথাই বলছেনা। মাঝে মাঝেই নিজের মনে বিড়বিড় করছে আর বলছে, 'মানুষ এতো নিষ্ঠুর হয়? তুই চুরি করলি, করলি, কিন্তু কুড়িকে মারলি কেন?'

Scanned by CamScanner

জলদাপাড়া জঙ্গলে

সমীরকুমার রায়

হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাবা-মায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে বা সুন্দরবনে বেড়িয়ে এসেছো। যারা এখনও যাওনি, তাদের জন্যই আমার এই লেখা।

১৯৬৬/৬৭ সালের কথা। সালটা ঠিক মনে নেই। কারণ এখন আমার বয়স ৮৮ বছর। পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। মনে আছে এখনও।

আমি, আমার স্ত্রী ও আমাদের ছেলে গিয়েছিলাম আসামে বেড়াতে। ওখানে আমার মাসতুতো ভাই কাজ করতো গৌহাটিতে। ওর ওখানেই আমরা উঠেছিলাম।

সে যাত্রা গৌহাটির কামাখ্যা মন্দির, ব্রহ্মপুত্র নদী, শিলং, চেরাপুঞ্জি এই সবই দেখা হয়েছিল। আসামের বিখ্যাত জঙ্গল কাজিরাঙা দেখার কোনও সুবিধা হ'লো না। মনে মনে বেশ দুঃখ ছিল এইজন্য।

আসাম থেকে ফিরে শিলিগুড়িতে আমার স্ত্রীর জ্যাঠতুতো দাদার বাড়িতে উঠলাম।

ভাবলাম কাজিরাঙা হয়নি তো, জলদাপাড়া হোক! জলদাপাড়া উত্তরবঙ্গের খুব বড়ো রিজার্ভ ফরেস্ট। বাঘ, হাতি, গন্ডার ইত্যাদি আরও অনেক জানোয়ার আছে।

ওখানে জঙ্গলের মধ্যে হলং বলে একটা জায়গা আছে। ওখানে বনবিভাগের বাংলো আছে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। আমার দাদা উত্তরবঙ্গে বনবিভাগের বড়কর্তা হিসেবে অনেকদিন ছিলেন। আমরা যখন শিলিগুড়ি যাই তার অনেক আগেই দাদা কলকাতায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি শিলিগুড়ির দাদাকে বললাম, আমাকে মাদারিহাটের ডি.এফ.ও (ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার) সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনটা ধরিয়ে দিতে। উনি সেটা করেছিলেন।

আমি ডি.এফ.ও সাহেবকে আমার পরিচয় দিলাম অর্থাৎ আমার দাদার নাম বলতেই আর আমি যে একদিন জলপাড়ার হলং বাংলোতে থাকতে চাই শুনে উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন ও আমাকে চলে আসতে বলেন।

আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেকে শিলিগুড়িতে দাদার বাড়িতে রেখে একাই রওনা হলাম। মাদারিহাট, জলদাপাড়ার আমি কিছুই জানি না। সরকারি বাসে চেপে বসলাম। কন্ডাক্টরকে বললাম আমাকে মাদারিহাটে নামিয়ে দিতে। সে বললো যে মাদারিহাটে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ডি.এফ.ও সাহেব আমাকে বলেছিলেন যে মাদারিহাটে বনবিভাগের লোক থাকবে। আমাকে জিপে হলং বাংলোতে পৌঁছে দেবে ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

Scanned by CamScanner

অন্ধকার নেমে এলো! চারদিক কেমন একটা বুনো বুনো ভাব। অন্ধকারেই নেমে পড়লাম মাদারিহাটে। কাছেই একটা ছোটো দোকান। ভয় ভয় লাগছিল। রাস্তার ডানদিক থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল আরম্ভ। যদি একটা বাঘ হালুম করে তবেই হয়েছে!

টিনের চালাঘরের দোকানটায় টিমটিম করছে একটা লণ্ঠনের আলো। গুটিগুটি দোকানটাতেই ঢুকলাম। দেখলাম দুজন ভদ্রলোক, সার্ট প্যান্ট পরা বসে গল্প করছেন। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, বনবিভাগের কেউ কি এখানে আছেন? ওঁরা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'আপনিই তো মিঃ রায়? আমরা আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। চলুন চলুন জিপ আছে।' একদম সোজা হলং বাংলো। অন্ধকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলার পথ। হেডলাইট জ্বালিয়ে জিপ চলেছে। আমার কাছে ব্যাপারটা নতুন। আগে কখনও এমন জঙ্গলের রাস্তায় চলিনি।

পৌঁছলাম হলং বাংলোতে। সাহেব ভদ্রলোকেরা আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'রাতের খাবার আপনার ঘরেই দিয়ে যাবে। সকালে হাতির পিঠে জঙ্গলে ঘুরতে যাবেন।' বাংলোর পাকাপোক্ত বাড়ি, তবুও কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছিল। বাঘের রাজত্বে, এমন একা র‍্যত কাটানোর অভিজ্ঞতা তো নেই!

জামাকাপড় বদলে, ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম, সঙ্গের সেই ভদ্রলোক দু'জন একটা জানলার কাছে বসে, ঘর অন্ধকার করে বাইরে দেখছেন। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, এই সময়ে বাঘ বাংলোর কাছে আসে। তবে বেশ কিছুক্ষণ বসেও তো বাঘমামার দেখা মিললো না।

ঘরে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ বাদে রাতের খাবার দিয়ে গেলো। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোচ্ছি কতক্ষণ জানি না। হঠাৎ বারে বারে মেঘের গর্জন। বাঘমামা বাংলোর একদম কাছে এসে ডাকাডাকি শুরু করেছেন। হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করতেই! গর্জন শুধু একবার নয়, বেশ কয়েকবার! একা ঘরে বসে বেশ ভয় করছিল। ঘরের বাইরেও গেলাম না ভয়ে। কিছুক্ষণ পরে গর্জন থেমে গেলো। আমিও নিশ্চিত হয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর এলো না। মনে একটু শান্তিও হ'লো যে বাঘ দেখা না হলেও এতো কাছ থেকে বুনো বাঘের গর্জন শোনা তো হলো! সকাল হ'লো। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। বনবিভাগের লোকেরা বললো রাতে বাঘ মাঝেমাঝেই বাংলোর কাছে চলে আসে।

বাইরে পোষা হাতি কয়েকটা বাঁধা ছিল, তাদের সঙ্গে দেখাশুনা করতেই বোধ হয় হাতিরাও উল্টে ডাক ছাড়ে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পরে দুপক্ষই থেমে যায়। আমার রাতটা কাটলো জঙ্গলের আবহাওয়াতেই। ব্রেকফাস্ট সেরে হাতির কাছে গেলাম। মাহুত সেলাম

Scanned by CamScanner

করে আমাকে হাতির পিঠে ওঠার কায়দা দেখিয়ে দিলো। হাতি অবশ্য তখন বসে ছিল। 'সোনার কেল্লা'য় জটায়ুর উটের পিঠে ওঠার কথা মনে পড়লো। সওয়ার শুধু মাহুত আর আমি। আর কোনও টুরিস্ট ছিল না সেদিন।

হাতি উঠে দাঁড়ালো ও এইবার দুলকি চালে চলতে লাগলো জঙ্গলের পথ ধরে। ক্রমশ জঙ্গলের রাস্তা ছেড়ে মাহুত হাতিকে বেতবনের মধ্যে নিয়ে চললো। বললো একটু ভিতরে ঢুকলে গন্ডার দেখা যেতে পারে। বাঘ এসব জায়গায় দিনের বেলা বেরোয় না। লম্বা লম্বা বেত গাছ। চলতে চলতে ফট ফট করে হাতির গায়ে ও আমাদের গায়েও লাগতে লাগলো। হঠাৎ মাহুত দেখালো কিছুটা দূরে গন্ডার পরিবার রয়েছে। দেখলাম, বোধ হয় রোদ পোহাচ্ছিল। আমাদের দেখে কোনও পাত্তা দিলো না। যেমন বসেছিল, তেমনই থাকলো। এইভাবে কিছুক্ষণ জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে ঘণ্টা দেড়েক বাদে আবার বাংলোয় ফিরে এলাম।

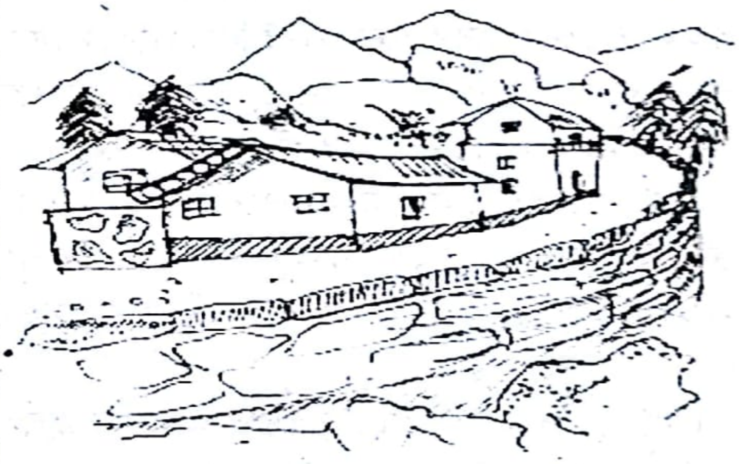

এবার ফেরার পালা। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় সব গুছিয়ে রাখলাম। ঘরের জানালা খোলা ছিল। হঠাৎ বনবিভাগের লোকজন হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠলো। জানালা দিয়ে চোখ বাইরে চলে গেলো। দেখি সামান্য কিছুটা দূরে লাফ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেলো একটা বাঘ। ওর হলুদ আর কালো ডোরাকাটা শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে পাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলো।

বনবিভাগের একজন লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি বাঘ দেখেছি কিনা! আমি বললাম—হ্যাঁ, দেখলাম তো!

এবার আর কি! ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। ওঁরা জিপে করে আমাকে মাদারিহাট পৌঁছে দিলেন। ওঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে শিলিগুড়ির বাস আসতেই উঠে বসলাম ও ঠিক সময়েই শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম।

আমার একদিনের এ্যাডভেঞ্চারও শেষ।

Scanned by CamScanner

ব্রতচারী গ্রাম ও গুরুসদয় দত্ত

তপতী মিত্র

ঠাকুরপুকুরে একটি দর্শনীয় স্থান ব্রতচারী গ্রামে গুরুসদয় দত্তের নামাঙ্কিত সংগ্রহশালা। কেবল ব্রতচারী আন্দোলনই নয়, বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলার নব জাগরণের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

গুরুসদয় দত্তের জন্ম শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামে, ১৮৮২ খ্রিঃ ১০ই মে। পিতা গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র দত্তচৌধুরী, মাতা আনন্দময়ী দেবী। মিউজিয়াম সংলগ্ন উদ্যানে তাঁর একটি মূর্তি বসানো হয়েছে। প্রতি বছর সেই মাঠে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপিত হয়; আর ঠিক পরদিনই পালিত হয় তাঁর জন্মদিন, যে অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ—ব্রতচারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শন এবং বাংলার লোকগান, নাচ ও শিল্পকলা। মাঠের একধারে দুটি বড়ো ঘর আছে, নিয়মিত সভা ও প্রদর্শনীর জন্য।

ছাত্র হিসেবে গুরুসদয় ছিলেন খুবই মেধাবী, আই.সি.এস.পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে ১৯০৫ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর বিবাহ হয় সরোজনলিনী দেবীর সঙ্গে, একটি পুত্রসন্তানও হয়। স্ত্রী ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী; কিন্তু আকস্মিকভাবে জন্ডিস রোগে মারা যান। ১৯২৫ সালে তাঁর স্মৃতিতে গঠিত হয় 'সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি'।

১৯২৯ সালে গুরুসদয় লন্ডনে গিয়ে একটি দেশবিদেশের লোকনৃত্যগীতের উৎসব এবং বয়েজ স্কাউটদের প্রদর্শন দেখার সুযোগ পান। তখন থেকেই তাঁর মনে চিন্তা জাগে নিজের দেশে ঐ রকমের অনুষ্ঠান করার। প্রথমে মৈমনসিংহ জেলার লোকনৃত্যগীত নিয়ে মেতে ওঠেন। পরে বীরভূমে গিয়ে দেখেন রায়বেঁশে নাচ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেন ঐতিহ্যময় কাঠের ভাস্কর্য এবং প্রাচীর চিত্রগুলি। ১৯৩১ খ্রিঃ তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা কমিটি'। বহু বিশিষ্ট গুণিজন এই সমিতিতে যোগ দেন। তিনি স্বয়ং সভাপতি হন; সহায়ক হন রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপিকার দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি জসীমুদ্দিন প্রমুখ।

১৯৩২ খ্রিঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁরা সিউড়ির রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে লোকশিল্প ও লোকক্রীড়ার ওপর শিক্ষাশিবির আয়োজিত করেন। সেখানে ছিল ঢোল কাঁসি মাদল ও গুবগুবা এসব বাজনার তালে কীর্তন, ঝুমুর, বাউল, সারিগান ইত্যাদি। সঙ্গে রায়বেঁশে, জারিগান ইত্যাদি নাচ। এছাড়াও ছিল দেশিয় খেলাধূলা ও জনসেবামূলক কাজ। এখানেই তিনি প্রথম ব্রতচারী দর্শনের কথা উল্লেখ করেন। স্কাউটদের ধাঁচে দেশজ খেলার সাথে ছন্দে গীতে বাঙালিয়ানার আদর্শে তাঁর এই নতুন ভাবনায় ছিল শারীরিক ও মানসিকভাবে বলীয়ান দক্ষ কর্মী হবার

Scanned by CamScanner

অনুশীলন। তাই শরীরচর্চার পাশাপাশি নাচগানকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্বপ্ন ছিল দেশের ভাবী প্রজন্মকে আদর্শ জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। স্ত্রী সরোজনলিনীও বিশ্বাস করতেন, তরুণ প্রজন্ম যদি নিজেদের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে এনে একইসঙ্গে লোকশিল্পের সৌন্দর্যকে গ্রহণ করে মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আপনা থেকেই দেশের দুঃখদুর্দশা ঘুচে যাবে। সে বছরই ২০ শে মার্চ কলকাতায় Indian Society of Oriental Art এর ভবনে তাঁর সংগৃহীত ১০০টি উপাদান নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, যার তদারকিতে ছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উদ্বোধনের দিন শিল্পাচার্যের সামনে কয়েকজন চিত্রকর পট দেখিয়ে গান শোনান। অনুষ্ঠানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেনের মতো অধ্যাপক গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করে ব্রতচারী গ্রামের জন্য জমি অধিগ্রহণের আর্জি জানান তিনি। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিঃ ২৫ শে জুন কর্কটরোগে অকালে প্রয়াত হন গুরুসদয় দত্ত। মৃত্যুর পর তাঁর উইলের নির্দেশমতো সেই জমিতে শিবিরবাড়ি, বিদ্যালয়, সংগ্রহশালা প্রভৃতি গড়ে তোলা হয় একে একে। ১৯৪৩ সালে স্থাপিত হয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৪৯ সালে ছেলেদের স্কুল এবং ১৯৬৬ সালে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। সেকালে বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। তিনি ছিলেন সকলের 'গুরুজী'। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কামারশালা, ছুতোর ঘর, এসবের সাথে সবজিবাগান, গোয়ালবাড়ি, এমনকী ধানখেতেও ছিল। আজকাল অবশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস ধরে পঠনপাঠন হয়, খেলাধূলার কোচিংও দেওয়া হয়।

মিউজিয়ামে সংরক্ষিত শিল্পকর্মগুলি অধিকাংশ বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা থেকে পাওয়া, সময়কাল উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক। প্রথমেই চোখে পড়ে নানা আকারের নকশি কাঁথা, অন্তঃপুরবাসী গৃহবধূদের হাতে তৈরী, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, প্রিয়জনদের উপহার দিতে। ফুল, লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, মানুষজন, পশুপাখি কি অপূর্ব সুন্দরভাবে রঙিন সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আছে 'দোজখী' কাঁথা, যার-সোজা উল্টো দুপিঠের কাজই সমান পরিষ্কার। কোনোটিতে সুতোয় আঁকা অন্দরমহল ও বাড়ির বাইরের খুঁটিনাটি জীবনযাত্রার ছবি। গায়ে দিতে যেমন 'সুজনি', তেমনি চোরের হাত থেকে গয়না টাকাকড়ি বাঁচাতে 'দুর্জনি', যা এক ধরনের বোতাম আঁটা পার্স!

অন্য ঘরে আছে গ্রামীণ শিল্পীদের আঁকা নানা পট। বেশির ভাগই জলরঙে আঁকা। যামিনী রায় একসময় এই পটুয়াদের কাছে শিখেছেন, তাঁর সেসময়ে আঁকা দুটি পটও আছে। অনেকগুলি কালীঘাটের পট রয়েছে, বাবুবিবি, পশুপাখি, নাচের দৃশ্য বা দেবদেবীর

Scanned by CamScanner

ছবি। আছে কাঠখোদাই করা ব্লকের সাহায্যে প্রিন্ট নেওয়া সাদাকালো ছবি। জড়ানো পটও আছে, যা দেখিয়ে গান গেয়ে গল্প বলা হতো। কোনোটা মাটির সরার উপর আঁকা। আছে 'চক্ষুদান পট'—কেউ মারা গেলে তার ছবি আঁকা হতো চোখ ছাড়া। সকালে উঠে আত্মীয়েরা দেখতো চোখ আঁকা হয়ে গেছে! সরল মনে তারা বিশ্বাস করতো, মৃতের আত্মাই বুঝি রাত্রে সবার অলক্ষে এসে চক্ষুদান করে গেছে!

এছাড়া আছে বড়ো রেকাবির মতো গোল আমসত্ত্বের ছাঁচ, দশাবতার তাস, পুতুল প্রভৃতি। এসমস্ত শিল্প আজ আবার নতুন করে প্রাণ পেয়েছে, বাংলার বাইরেও জায়গা করে নিয়েছে। এজন্য গুরুদাস দত্তের মতো মনীষীদের কাছে আমরা অনেক ঋণী। সবশেষে, ব্রতচারীদের গানের কয়েকটি লাইনঃ—

(১) "চল কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
যত ব্যাধির বালাই
বলে পালাই পালাই—"

(২) "ছুটব খেলব হাসব
সবায় ভালবাসব
গুরুজনকে মানব
সত্য পথে চলব—"

মনমাতানো মসলিন

সর্বাণী মুখার্জী

ভারতবর্ষে তখন চলছে মোগল সম্রাটদের শাসন। বাদশাহি গদিতে বসে আছেন সম্রাট শাহজাহান। এদেশে তখন বহু বিদেশি বণিকের ভিড়। ফরাসি দেশ থেকে এসেছিলেন টাভেরনিয়ার। হিরে মুক্তোর কারবারি। একদিন তাঁর সামনে একজন লোক এসে ব্যবসার নানারকম আলাপ আলোচনা করছে। হঠাৎ সে পাখির ডিমের মতো একটা ছোট্ট কৌটো খুললো। আর তা থেকে বার হলো একটা ষাট হাত লম্বা মাথার পাগড়ি। সে কাপড় এতটাই সূক্ষ্ম যে তাকে হাতে নিয়ে টাভেরনিয়ারের মনেই হলো না যে তিনি কিছু ছুঁয়েছেন। এটা ছিল বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড়ের পাগড়ি।

এই মসলিন তৈরি হতো ঢাকায়। আর রপ্তানি হতো গোটা বিশ্বে। শোনা যায় ২০ গজ মসলিন ছোট্ট একটা নস্যির কৌটোর মধ্যেও ভরে রাখা যেতো। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের বেগম মেহেরুন্নেসা যখন বাংলার বর্ধমান থেকে আগ্রায় গিয়ে বাদশার মহলে এসে নূরজাহান হলেন, তখন তিনিই মোগলদের কাছে এর কদর বাড়িয়েছিলেন। এই সময় একটা মসলিন কাপড়ের দাম ছিল চারশো টাকা। মসলিনের আর এক নাম ছিল আর-ই-য়ওয়ান, মানে হলো চলন্ত জলধারা।

সেকালের অনেক বিখ্যাত মানুষজনদের লেখাতেও মসলিন কাপড়ের প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে। তেমনই সব লেখা থেকে জানা যায় যে মসলিন কাপড় যদি রাতের বেলা খোলা মাঠে বিছিয়ে রাখা হতো, তবে তার উপর শিশির পড়লে সেই কাপড়কে আর দেখাই যেতো না। এমনই সূক্ষ্ম ছিল তার বুনন, যে একটা আংটির ফাঁক দিয়েও মসলিন কাপড় গলে যেতো।

বিদেশি বণিকদের লেখা থেকে জানা যায় তখন মাথায় মসলিন কাপড়ের পাগড়ি মাথায় বাঁধা ছিল বড়মানুষির পরিচয়।

ধীরে ধীরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মসলিন হারিয়ে ছিল তার গৌরব। এখন আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে সেই অসাধারণ শিল্পকে।

Scanned by CamScanner

ধাঁধা

তাজ্জব কী বাত
বাঁদর বসলে ফুলের পাশে
রসনার আহ্লাদ

*

শুরুতে হাজির শরীর
শেষে এলো দা
কৌশলে করে তবে
পাঁককে হটা

*

দেশ আমাদের অন্নদাতা
অন্নকে তাই খুঁজে পাবে
দায় নিয়েছে দেশ আমাদের
তাই সে বসে নামের আগে
তিরঙ্গটার মান রাখাটা
সবার চেয়ে বড়ো কথা
দেশ আমাদের স্বাধীন সে দেশ
ভুলে না যাই সেই কথাটা

*

বক বক করাটাই তার যে স্বভাব
কথা শুনে ঝালাপালা আমাদের কান
অথচ শিশুর বাস তারি মাঝখানে
অন্নও খুঁজে পাবে, করো সন্ধান

*

নেশার বস্তু জেনো তিন অক্ষরে নাম
পাতা থেকে জন্ম মোর খেতই মোর ধাম
আমাকে সেবন করে যতো নেশাখোর
শুরুতে মিলবে ধাতু, জোড়া দু অক্ষর।

উত্তর: ৩০পাতায়

Scanned by CamScanner

জানা অজানা

জানকী

এই তো সেদিন শুরু হলো ২০১৮ সাল। এরই মধ্যে কেটে গেলো প্রায় তিন তিনটে মাস। আমাদের অল্প বয়সে ইংরিজি নতুন বছর আর বাংলা নববর্ষ-এই দুটি উৎসবের একটা উপহারই ছিল— ইংরিজি আর বাংলা নতুন ক্যালেন্ডার। একপাতার ক্যালেন্ডার পেলে তখন মন খারাপ হয়ে যেতো। ওগুলো ছিল অফিস কাছারিতে কাজের জন্যে রাখা। তখন বাইরের ঘর সাজানোর একটা অঙ্গই ছিল দেওয়ালে কিংবা টেবিলের ওপর একটা সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার রাখা। নামীদামি শিল্পীদের আঁকা, কিংবা তোলা ছবি দিয়ে তৈরি হতো সে সব দিনের ক্যালেন্ডার। আমাদের মধ্যে তো রীতিমতো প্রতিযোগিতা বেধে যেতো কার বাড়িতে কটা ভালো ক্যালেন্ডার আছে এই নিয়ে। ১লা বৈশাখ যে বাংলা ক্যালেন্ডার বেরতো বেশিরভাগ সময়েই তাতে থাকতো ঠাকুর দেবতার ছবি। আর সেগুলো ব্যবহার হতো পঞ্জিকার বিকল্প হিসেবে। কোন দিন একাদশী, অমাবস্যা, ইতুপুজো, শিবরাত্রি পড়েছে তা লাল রঙ দিয়ে লেখা থাকতো। বড়ো বড়ো পুজো আর বিয়ে পইতে এইসব দিনের কথা তো বটেই। আমরা সে সব ক্যালেন্ডার দেখতাম বাংলা মাসগুলোর নাম মনে রাখার জন্যে। এখনও ইংরিজি আর বাঙলা ক্যালেন্ডার বেরোয় ঠিকই, কন্তু দেওয়ালে টাঙানোর রেওয়াজটা কমে গেছে। ফোন, হাতঘড়ি, কমপিউটার এসব থেকে এত সহজে দিনক্ষণ সব জেনে নেওয়া যায় যে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার দেখার দরকারই পড়ে না। এমনকী আগামী বছরগুলোর দিনক্ষণের আগাম খবরও এখন যে কেউই পেয়ে যেতে পারে যখন ইচ্ছে তখন। আঙুল দিয়ে একটা বোতাম ছুঁলেই হলো।

সে যাই হোক, ক্যালেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু কমেনি একটুও। সারা বছর ধরে তার করা এই হিসেবটিকে আমাদের সঙ্গে রাখতে হয় নিজেদের নানা রকম কাজকর্মের তাগিদে। আর সেই তাগিদেই বহু বহু বছর আগে ক্যালেন্ডার বস্তুটি প্রথম তৈরি হয় রোমে। নানা রকম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এখন যে ক্যালেন্ডার আমরা হাতে পাই, যা কিনা সারা বিশ্বেই মেনে নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় গ্রেগারিয়ান ক্যালেন্ডার। রোমের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি এই ক্যালেন্ডার তৈরি করেন ১৮৫২ সালে। এর আগে যে ক্যালেন্ডার চালু ছিল তাকে বলা হতো জুলিয়াস ক্যালেন্ডার। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এটির প্রচলন হয়েছিল বলে তাঁর নামেই এর পরিচয়।

Scanned by CamScanner

রোমে প্রথমে যে ক্যালেন্ডার চালু হয় তাতে দেখানো হতো মোট দশ মাস। আর মজার ব্যাপার এই যে, মার্চ মাস, মানে যে মাসে তোমরা পত্রিকার এ সংখ্যাটি পেতে চলেছো, সেই মার্চ মাস দিয়েই শুরু হতো নতুন বছর। শেষটা হতো অবশ্য ডিসেম্বর মাস দিয়েই। তখন একটা বছরে থাকতো ৩০৪ দিন, ৩৬৫ দিন নয়। ছ মাস হতো ৩০ দিনের আর বাকি চার মাস একত্রিশ দিনের। জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাস এসে জুটলো বেশ কিছুদিন পরে আর তাদের জন্ম হলো যতদূর সম্ভব রোমের সম্রাট নিউমো পম্পিলাসের আমলে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। বছরে তখন দিনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩৫৫। বাকি রইলো আরও দশ দিন। সে দশ দিন যোগ হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরির হাত ধরে আর তাঁর তৈরি ৩৬৫ দিনের ক্যালেন্ডারের আজও বদল হয়নি। তবে ভবিষ্যতে যে হবে না এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

মার্চ দিয়ে শুরু হতো যে ক্যালেন্ডার, সেই মার্চ মাসকে যেন এক রকম গায়ের জোরেই তৃতীয় স্থানে নামিয়ে দিলো জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাস। অথচ মার্চ মাসকে ক্যালেন্ডারের শুরুতে রাখার পেছনে কারণও ছিল। মার্চ মাসের আবহাওয়া ভারি মনোরম। জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে শীতের দাপট এতটাই যে তখন যুদ্ধে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। অথচ রোমানরা হলো যুদ্ধপ্রিয় জাতি। যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে মার্চ মাসটাই সবথেকে উপযুক্ত সময়। তাই ক্যালেন্ডার আবিষ্কারের শুরুতে মার্চ মাসকেই স্থান দেওয়া হলো সবার আগে। যুদ্ধের দেবতা হলেন মরিশিয়াস (Mauritius)। এই মরিশিয়াসই হয়ে গেলেন মার্স (Mars) আর তাঁর নামেই নাম রাখা হলো বছরের প্রথম মাসটির—মার্চ। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলেই মার্চ মাসকে তৃতীয় স্থানে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

ক্যালেন্ডারের বাকি মাসগুলোর নামকরণের পেছনেও এরকম নানা কারণ আছে। কখনও দেবদেবী, কখনও বা ক্ষমতাবান লোকেদের নামে তাদের নাম। আমি চাই, তোমরা নিজেরা কৌতূহলী হয়ে সে সব কারণগুলো জেনে নাও। আমি বলে দেওয়ার থেকে নিজেরা খুঁজে বের করলে দেখবে ভারি আনন্দ হবে মনে। মাসের মতন সপ্তাহের সাতটা দিনের নামের পেছনেও এরকম সব কারণ আছে। খুঁজে বার করে তোমাদের কেউ যদি তা লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দাও, ভারি খুশি হবো আর ছাপবো তো নিশ্চয়ই।

Scanned by CamScanner

শব্দ বাক্স

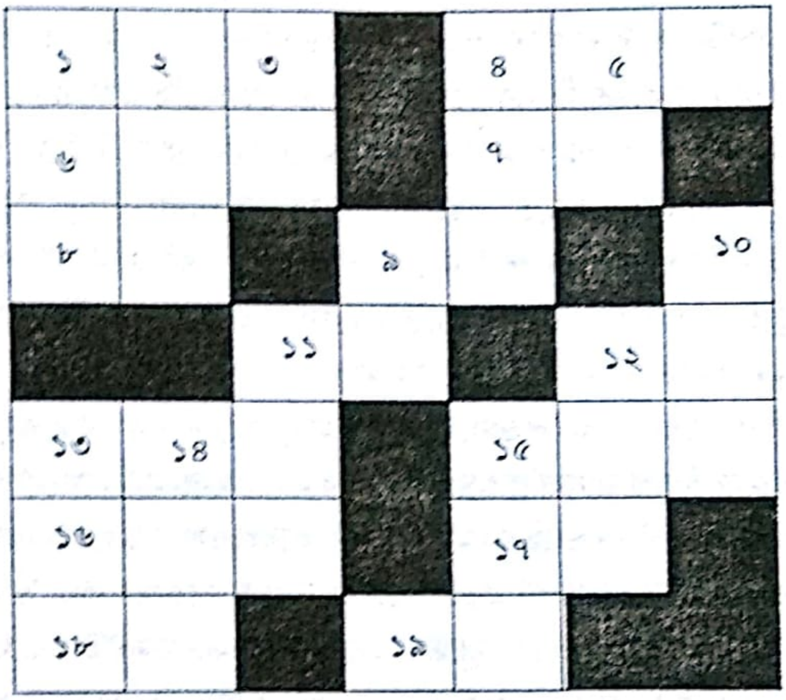

সূত্রঃ পাশাপাশি- (১) উপজাতি বিশেষ (৪) তরল এক ধাতু (৬) মুসলমানদের ইষ্ট মন্ত্র, (৭) প্রতারক (৮) বিনাশ (৯) কথা (১১) শস্য বিশেষ (১২) পঞ্জিকা মতে নির্দিষ্ট বিশেষ দিন (১৩) প্রকার/ধরন (১৫) যে শ্রম করে (১৬) রাত্রি/এক নদীর নাম (১৭) নর (১৮) পুরাণের এক রাজা (১৯) যুদ্ধ

ওপর-নিচ-১) মাছের আঁশ (২) বালা (৩) লক্ষ্মী (৪) পড়ুয়া (৫) কপালের শিরা (৯) বন্যা (১০) পথচারী (১১) সাঁওতালদের এক বাদ্যযন্ত্র (১২) অন্ধকার (১৩) রত্ন (কবিতায়) (১৪) পদ্ম (১৫) বৌদ্ধ ভিক্ষু

উত্তর: ৪৩ পাতায়

Scanned by CamScanner

হারিয়ে গেছে যে সব খেলা

সুনেত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

—তোরা কী করছিস রে সব খুটুর খুটুর করে? —বড়মামার প্রশ্নে ঘরের সবাই মুখ তুলে একবার তাকিয়েই নামিয়ে নিলো, কেউ কোনো জবাব দিলো না। বড়মামি রেগে গিয়ে বললে—এ কি অসভ্যতা! প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

বড়মামি বড়মামাকে বললো—ছেড়ে দাও, ওদের কাছে তুমি সভ্যতা ভদ্রতা আশা কোরো না জমানা বদল গয়া।

বড়মামা রেগে গেলো খুব—তুমি চুপ করবে?

ব্যাপারটা ঝগড়ার দিকে যাচ্ছে দেখে টুকাই বলে উঠলো—আরে আমরা একটা গেম খেলছি। ডিসটার্ব কোরো না।

—গেম! মোবাইল ফোনে আবার কী গেম খেলছিস?

—এগুলোকে ভিডিও গেম বলে। দারুণ ইনটারেসটিং।

—হুঁ ভারি খেলা! এতে করে তোদের শরীরচর্চা হচ্ছে কই? মাথাটাই বা কত খেলাচ্ছিস জানা আছে।

টুবাই অমনি বলে ওঠে—আরে আমরা তো ক্রিকেট ব্যাডমিন্টনও খেলি।

—ওগুলো তো সাহেবদের খেলা। বলি তোরা হাডুডু, এক্কাদোক্কা খেলেছিস্? বুড়িবাসন্তী, আইকম বাইকম রুমালচোর, লুকোচুরি খেলেছিস?

বড়মামির এই কথা শুনে ভাগ্নে ভাগ্নিরা হাঁ করে চেয়ে রইলো।

—এ খেলাগুলোর তো নাম শুনিনি। কি অদ্ভুত শুনতে।— টুবাই বললে।

—তা শুনবে কেন? সারাক্ষণ তো কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছো আর ভিডিও গেম খেলছো। তোমাদের বড়মামি যে সব খেলার নাম করলো সেগুলো আমাদের ছেলেবেলার খেলা। যদিও মেয়েরাই বেশি খেলতো এগুলো। এ খেলাগুলোতে মাথা খেলাতে হতো না, তবে হাত পা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হতো। আহা! কি সুন্দর সেইসব খেলা। হারিয়ে গেলো সব। তোদের তো শৈশব কৈশোর হারিয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন যান্ত্রিক খেলায়।

রিয়া বললো—মামি আরেকবার বলো তো কী যেন বাসন্তী বললে।

—বুড়ি বাসন্তী। সে আবার কি খেলা? বাসন্তী নামে কোনো বুড়িকে নিয়ে খেলা?

Scanned by CamScanner

—যাঃ কী সব বকছিস। বুড়ি বাসন্তী খেলা বেশ মজার। কেউ কেউ আবার বউ বাসন্তী বলতো।

—শোনাও না কেমন মজার খেলা।

—তবু ভাগ্যি শুনতে চাইলে। খেলাগুলো মেয়েদের খেলা হলেও কখনও কখনও ছেলেরাও কিন্তু খেলতো। আমরা খেলতাম ডাংগুলি দড়ি টানাটানি যাকে ইংরিজিতে তোরা বলিস টাগ অবওয়ার। এক্কাদোক্কাও খেলতাম। আর খেলতাম পিট্টু আর লাট্টু। ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন তখন এতটা জনপ্রিয় ছিলনা। ও ছিল বড়লোকদের খেলা। খেলা নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেতো। আর কি যে উত্তেজনা। তোদের ভিডিও গেম সেসব খেলার কাছে তুচ্ছ।

ছেলেমেয়েরা বড়োমামার কথা শুনে চুপ হয়ে গেছে। ওরা যে ভিডিও গেম খেলছিল, তাও বেমালুম ভুলে গেছে। বড়মামি বললে—হ্যাঁ রিয়া, তুই কি জানতে চাইছিলি? বুড়ি বাসন্তী? ওটা হলো দাগ কেটে একটা গোল করা হতো। সেই গোলে থাকতো দুজন খেলুড়ে। একজন হতো বুড়ি আর একজন তার হাত শক্ত করে ধরে থাকতো। খোপের বাইরে থাকতো কয়েকজন অন্য সব খেলুড়ে। এক খেলুড়ে বুড়িকে খোপ থেকে বাইরে আনার চেষ্টা করতো হাত ধরে টেনে আর খোপের ভেতরে থাকা অন্য খেলুড়েটা তার হাত শক্ত করে ধরে রাখতো যাতে বুড়ি বাইরে না যেতে পারে। গায়ের জোরে যে বুড়িকে বের করে আনতো সেই হতো তখন বুড়ি, তখন আবার অন্য কোনো খেলুড়ে তার হাত ধরে টেনে বার করার চেষ্টা করতো। এইভাবে খেলতে খেলতে শেষ পর্যন্ত বুড়িকে খেলুড়ে যদি খোপের মধ্যে টেনে রাখতে পারতো তারই হতো জিত। খেলাটার নাম বুড়ি বাসন্তী কেন হলো সে কথা জিগ্যেস করলে বলতে পারবো না তবে খেলাটা আমাদের খেলতে বেশ ভালোই লাগতো। তারপর ছিল এক্কাদোক্কা।

রিয়া বললো—এটা আমি জানি। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলে। চক দিয়ে কয়েকটা খোপ কেটে লাফিয়ে লাফিয়ে টপকায়। কি ঠিক বলেছি না?

—হ্যাঁ একদম ঠিক। তবে দাগে পা পড়লে বা দাগের বাইরে পা গেলে মোড়।

—মোড় মানে?

—মোড় মানে আউট।

—বাঃ বেশ দারুণ তো। খেললে হয়।

—এবার তুমি থামো তো—বড়মামা ধমকে ওঠে।—টুবাই পাপাই বেচারাদের মেয়েদের খেলার কথা শুনতে ভালো লাগছে না। এবার আমি বলি।

Scanned by CamScanner

—শোন ডাংগুলির কথা বলছিলাম না, ডাংগুলি হলো একটা ছোটো একটু মোটা মতো লাঠি। আর থাকতো আরও ছোটো কাঠের একটা টুকরো। রাস্তায় বা মাঠে গর্ত তৈরি করে তাতে বড়ো লাঠিটা ঠেকিয়ে জোরসে ছুঁড়ে দিতে হতো। বলতে পারিস জ্যাভলিনের আদিম গ্রাম্য সংস্করণ।

—বাঁশের টুকরো নিয়ে খেলতে?

—না, বাঁশের নয়। তবে ওই আদাড় বাদাড় থেকে কুড়িয়ে এনে চেঁছে নিয়ে পটলের আকৃতি দিয়ে তৈরি হতো ছোটো টুকরোটা। ওটা দিয়েই খেলা হতো। যে জিততো সেই হিরোর সম্মান পেতো। ছোটো লাঠি দিয়ে টুকরো কাঠটা দূরে ছোঁড়া চাট্টিখানি কথা নাকি? আর ছিল পিট্টু খেলা। কখনও যদি গ্রামের দিকে যাস এই খেলাটা এখনও দেখতে পাবি। কয়েকটা চ্যাপ্টা ইটের টুকরো একটার ওপর আরেকটা সাজানো হতো। ওটাকে বলতো পিট্টু। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে তাক করে বল ছুঁড়ে পিট্টু ভাঙা। ভাঙার পর ইটগুলোকে সাজিয়ে দিতে হতো আগের মতো। ভেঙে সাজিয়ে দিতো যে কম সময়ে সেই হতো বিজয়ী।

মামার কথা শুনে সবার মুখ হাঁ। এসব কী খেলার কথা শুনছে ওরা? বেশ কিছুদিন আগে পোকেমন বলে একটা অদ্ভুত খেলা নিয়ে পাগলামো হচ্ছিলো। মামার বলা খেলাগুলোর কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যি আগেকার দিনের খেলাগুলো একবার খেললে হয়। মামি বললো—তাও তো তোদের আইকম বাইকম খেলার কথা বলিনি।

আইকম বাইকম টা কি মামি?—টুবাই জানতে চাইলে মামি বললে— বলছি দাঁড়া।

এই বলে ডিবে থেকে একটা পান মুখে দিলো। তারপর শুরু করলো— খেলাটার নাম আইকম বাইকম কেন আমি জানি না। তবে খেলাটা ছিল বেশ মজার। কয়েকজন খেলুড়ে হাতদুটো ওপরে তুলে জোড়া লাগিয়ে পরপর লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকতো আর বাকি কয়েকজন খেলুড়ে সেই লাইনের তলা দিয়ে চলতো ছড়া কাটতে কাটতে —

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি
রেল গাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম

ছড়া শেষ হলেই উঁচু করে তোলা খেলোয়াড়দের হাতগুলো ঝপাং করে নেমে আসতো। যেমন লেভেল ক্রসিং-এর গেট পড়ে সেরকম। তার আগেই যদি লাইন থেকে বেরোতে পারো তাহলে তোমার জিত। কিন্তু ছড়া শেষ হবার আগে যদি লাইনে আটকে পড়ো তবে

Scanned by CamScanner

বাদ যেতে হতো। আমাদের ছেলেবেলায় এই খেলাটির খুব চল ছিল। এখন আর কারুর মুখে নামটা শোনা যায় না। তোরা বললে বিশ্বাস করবি না আমি একবার হাডুডু প্রতিযোগিতায় দারুণ খেলেছিলাম

—তুমি? বলছো কি?— পাপাই তো অবাক।

—তুমি তো রোগা, কী করে খেললে?

—আরে এখন কি দেখছিস, এর থেকেও রোগা ছিলাম। সেই রোগা চেহারা নিয়ে এমন খেলেছিলাম যে দর্শকরা বিজয়ী দলকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে সবাই হৈ হৈ করেছিল।

বড়মামা সায় দিলো—তোদের মামি ঠিকই বলেছে।

—তুমি কী করে জানলে? তুমি কি মামিকে চিনতে?

পাপাই এর প্রশ্ন শুনে মামা বললো, আরে আমাদের পাড়াতেই তো তোর মামি খেলতে গিয়েছিল। সে এমন এক খেলা উত্তেজনার পারদ একেবারে তুঙ্গে উঠেছিল। পরে যখন তোদের মামি আমাদের বাড়ির বউ হয়ে এলো তখন দেখেই চিনতে পেরেছি। এই সেই চুকিত্ কিত্ খেলার রোগা মেয়েটা! এমন খেলা খেলেছিল সেদিন যে পাড়ার সবাই মনে রেখেছে।

বড়মামার কথা শুনে মামি লজ্জায় মুখ নিচু করলো।

—থাক অনেক বকলাম। এবার বল তোদের খেলাগুলোর কথা। সেকেলে মানুষ আমরা, তোদের আধুনিক সফিসটিকেটেড খেলার নামধাম জানি না।

মামার কথা শুনে ভাগ্নে ভাগ্নিরা চুপ। কোন খেলার কথা বলবে? ক্রিকেট ফুটবল টেনিস বাস্কেটবল বিলিয়ার্ডস, ভলিবল ব্যাডমিন্টন কতো খেলাই তো আছে। তার ওপর এখন আছে ভিডিও গেম। মাথা নিচু করে বোতাম টিপে খেলে যাও, হার জিতের আনন্দ নেই। নেই ধুলোমাখা মাটিমাখা মুখে মুখে ছড়া কেটে খেলার আনন্দ। নিয়ম পদ্ধতির জাঁতাকলে পড়ে খেলাগুলোও কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। টুবাই পাপাই রিয়া টুম্পাদের মনে হলো মামামামির ছেলেবেলার আমলের খেলাগুলো একবার খেলে দেখলে হয়।

ধাঁধার উত্তর: ফুলকপিঃ কায়দাঃ ভারতঃ বাচালঃ তামাক

Scanned by CamScanner

জানো কি?

ত্রিনয়ন ঘোষ

১) "আই নো দ্যাট আই নো নাথিং অথবা "দি ওন্‌লি থিং আই নো ইজ্ দ্যাট আই নো নাথিং" —বিখ্যাত এই উক্তিটি কার?

২) পঞ্চ নদের দেশ পাঞ্জাব-পাঁচটি নদী কী কী?

৩) ভারতের সবচেয়ে বড়ো বেসরকারি ব্যাঙ্ক ICICI পুরোটা কী?

৪) লেডি গাগা, রিহানা, বিয়ন্সে, কেটি পেরী, টেলর সুইফ্ট এঁদের মধ্যে মিল কোথায়?

৫) ইউরোপ, আফ্রিকা ও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কোনগুলি?

৬) জাপানি ক্যারাও (Karaoke) সিংগিং এখন খুবই জনপ্রিয়। এর মানে কী?

৭) আধুনিক সিনেমায় "VFX". টেক্‌নলজির ব্যবহার (যেমন জুরাসিক পার্ক) আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। এই VFX ব্যাপারটি কী?

৮) টী (tee), ক্যাডি (caddie), বোগি (bogey), বার্ডি (birdic), পাট্ (putt) এই শব্দগুলি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

৯) প্রকৃতির বিস্ময়-একটি প্রজাতির জীবিত মাছেরা ডিম পাড়া ও মৃত্যুর জন্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পুনরায় তার জন্মস্থানে ফিরে আসে। মাছটিকে আমরা কী নামে চিনি?

১০) সাজের জন্য মাথায় বা গলায় যে রঙিন ফেট্টি বা বড়ো রুমাল বাঁধা হয় তাকে কী বলা হয়?

উত্তর

১) সক্রেটিস্ (Socrates)

২) বিপাশা (The Beas), খ) বিতস্তা (The Jhelum), গ) শতদ্রু (The Sutlej), ঘ) চন্দ্রভাগা (The Chenub), ঙ) ইরাবতী [The Ravi (The irrawaddi in Myanmer]

৩) Industrial Credit and Investment Corporation of India

৪) এঁরা প্রত্যেকেই প্রথিতযশা পপ্ সিংগার ও সং-রাইটার

৫) ক) ইউরোপ-মাউন্ট এলব্রাস/এলব্রুস (Mt. Elbrus)-5642 metres

(খ) আফ্রিকা-মাউন্ট কিলিমান্‌জারো (Mt. Kilimanjaro)-5895 metres

গ) অ্যান্টার্কটিকা-মাউন্ট ভিনসন (Mt. Vinson) 4897 metres

৬) এটি একধরনের "মনোরঞ্জন" যেখানে অপেশাদার গায়ক/ গায়িকারা আগে থেকে রেকর্ড করা ব্যাকিং ট্র্যাকের সহায়তায় মাইক্রোফোনের সামনে জনপ্রিয় গানগুলি গেয়ে থাকেন।

৭) ভিজিউয়্যাল এফেক্টস্ (Visual Effects)Ð যখন ফিল্ম বা অন্য মুভিতে লাইভ শুটিং সম্ভব হয় না তখন কম্পিউটারের সাহায্যে চিত্রাবলিকে (ইমেজারি) সৃষ্টি, পরিবর্তন বা বর্ধিত করার প্রক্রিয়া।

৮) গল্‌ফ

৯) স্যামন (Salmon) মাছ

১০) ব্যানডানা (bandana)

Scanned by CamScanner

পূর্ব সিকিমে পাঁচ দিন

মানসকুমার আঢ্য

আমাদের গাড়িটা দুটো পরিবারকে নিয়ে যখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়লো তখন সকাল ৯.৪০ বাজে। আমাদের দলে দুটি পরিবারের নয়জন সদস্য আর উদ্যোক্তাদের তরফে সুকান্ত ও ড্রাইভার লাওডি শেরপাকে (ডাকনাম লামা) নিয়ে মোট ১১ জন। সেবক রোড ধরে গ্যাংটকের রাস্তায় চলেছি। তিস্তা ব্রিজের আগেই ডানদিকে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা নেমে গেছে। তিস্তা ব্রিজের ঠিক পরেই ডান দিকে ঘুরে গেছে কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা।

গ্যাংটকের ৪০ কি.মি. আগে রংপো বাজার, জমজমাট এলাকা। এখান থেকে সোজা রাস্তাটা গ্যাংটক গেছে আর ডানদিকের রাস্তাটা পূর্ব সিকিমের দিকে গেছে। আমাদের প্রথম রাত্রিবাস পূর্ব সিকিমের ত্যারিতারএ। এতক্ষণ তিস্তার পাড় ধরে এলেও এবার আমরা রোড়য়াং নদীর ধার ঘেঁসে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চললাম। অনেক ওষুধ কম্পানির কারখানা নদীর পাড় ধরে, কিন্তু রাস্তাটা একেবারে জঘন্য। সারা রাস্তায় পিচ ওঠা, ধুলো। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় লাফাতে লাফাতে গাড়ি চললো। বেলা ২.৩০ নাগাদ আমরা মদন রাই এর বোখিম ভিলেজ রিসর্টে পৌঁছলাম। অর্থাৎ ৫ ঘন্টার জিপযাত্রা। পৌঁছেই চোখ জুড়িয়ে গেলো। পাহাড়ের ঢালে কি সুন্দর চারতলা বাড়ি, যেন স্টার হোটেল। সামনেই উন্মুক্ত পাহাড় শ্রেণির পিছনে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা সদর্পে বিরাজমান। রিসর্টের উচ্চতা ৬০০০ ফুট।

আমরা দ্রুত স্নান খাওয়া করে গেলাম মানথিং সানসেট ভিউ পয়েন্ট। ১৭৫ টা বড়ো বড়ো সিঁড়ি পেরিয়ে চূড়ায় শিব মন্দিরের চারপাশ ঘিরে ভিউ পয়েন্ট। সূর্য ডোবার যে রক্তিম দৃশ্য দেখলাম, পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডোবার এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে একটা বড়ো বৌদ্ধ মনাস্ট্রি দেখে রিসর্টে ফিরলাম, তারপর সামনের লনে বসে আড্ডা, চা পান আর তারপর রাতের খাওয়া সেরে বিশ্রাম।

পরদিন চান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরোলাম সিল্করুট দেখতে। এখান থেকে আরও ৫ ঘন্টার যাত্রাপথ, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, প্রথমেই পৌঁছলাম বংলি বাজার। বেশ ঘন জনপদ। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, কেউ কেউ এটা ওটা কিনলো—আবার যাত্রা। বাজার এলাকার পরেই লিংথাম চেকপোস্ট। এর পরের এলাকা যেহেতু প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন, তাই উপযুক্ত ছাড়পত্র ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

Scanned by CamScanner

ছাড়া পেয়ে আরও কিছুদূর এসে কিউখোলা ফল্‌স। পাহাড়ের গা বেয়ে লাফাতে লাফাতে ঝরনার জল নেমে বড়ো বড়ো পাথরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। সব গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে, সবাই নেমে ঝরনার জলে আনন্দ করছে, ফটো তুলছে ইত্যাদি।

এবার আমরা ধীরে ধীরে উপরে উঠছি। শীতের প্রকোপ বাড়ছে। প্রথমেই রাস্তার উপর পাঙ্গোলাখা ফরেস্ট চেকপোস্ট। যেহেতু এটা ওয়াইল্ড লাইফ সংচুয়ারি, তাই প্রবেশের জন্য নাম লেখাতে হয়।

এবার জঙ্গলের গাছের প্রকৃতির বদল হলো। শাল সেগুনের পরে এবার পাইন গাছের সারি। এটা পেরোতে পেরোতে ফাদন চেন পুলিশ চেকপোস্ট, আবার কাগজ দেখাও। এরপর আর গাছপালা নেই, একেবারে ন্যাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা।

একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলাম। মিলিটারি এলাকা, সঙ্গে কিছু সিভিলিয়ানের বস্তিও। জায়গাটার নাম জুলুক (৯৪০০ ফুট)। তারপরই শুরু হলো ভুলভুলাইয়া। পাহাড়ের গা বেয়ে শুধুই আঁকাবাঁকা রাস্তা। আমি নিজেই অন্তত ৫০টা হেয়ারপিন বেন্ড গুনেছি। গানেক এ এসে একটু দাঁড়ালাম (১১৯০০ ফুট) চা আর পপকর্ন খাওয়া হলো। শুনেছি পপকর্ন খেলে শীত কম মনে হয়।

দোকানদার বেশ বয়স্ক লোক, জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে সিল্ক রুটটা কোথায়? শুনেছি জুলুকের আশেপাশেই কোথাও সিল্করুট, সোজা চিনা বর্ডার থেকে এসেছে! দোকানদার শুনে বললো, পাশের যে কাঁচা রাস্তা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে গেছে, এটাই অনেক ঘুরে চলে গেছে চিনে। এই সব রাস্তা ধরে উট, গাধা, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে চিনারা সওদা করতে আসতো। বিশ্বাস হলো না, ভাবলাম আরও জিজ্ঞাসাবাদের দরকার।

আবার ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছি, এবার পৌঁছলাম লুংথাংএ। ন্যাড়াপাহাড়, (১৩০০০ ফুট) এখানে আমাদের রাত্রিবাস, হোমস্টে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের কোনায় চারটে ঘর নিয়ে টিনের বাড়ি, পাশে রান্না আর খাওয়ার জায়গা। পাহাড়ের এতো কোনায়, মনে হচ্ছে যে কোনও সময়ে সবশুদ্ধ ভেঙে নিচের খাদে পড়ে যেতে পারে। যেমন প্রচণ্ড ঠান্ডা তেমনি শ্বাসকষ্ট। এক একটা সিঁড়ি উঠতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছি। ফুসফুসে যেন পুরো হাওয়া কখনই ভরছেনা। ঘরের জানলার পিছনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। উঃ ভাবা যায় না এত সুন্দর। রাতে শুরু হলো ঠান্ডা, দুটো তিনটে করে লেপকম্পল চাপা দিয়েও যাচ্ছে না, সারারাত আমরা জেগে। লেপের মধ্যেই আমরা ঠকঠক করে কাঁপছি।

সকাল হতেই নিচের দিকে দৃষ্টি গেলো, দেখি অনেক নিচে জুলুক আর ভুলভুলাইয়া

Scanned by CamScanner

একসাথে দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গা দিয়ে পেঁচানো রাস্তা, ছোটো খেলনার মতো গাড়ি গুলো যাচ্ছে আসছে, অপূর্ব ক্যানভাসে আঁকা ছবি। এতোসুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখিনি। আমরা ব্রেকফাস্ট করেই রওনা দিলাম, আরও উপরে যেতে হবে।

প্রথমেই গেলাম নাথাং ভ্যালিতে, এখানেও মিলিটারি আর সিভিলিয়ানদের সহাবস্থান। চারিদিকের পাহাড়ের ঢালে ক্যালেন্ডারের ছবির মতো সাজানো নাথাং, প্রচুর চমরি গাই চরছে, সবুজ টিনের মিলিটারি ব্যারাক আর সাদা টিনের বাড়িগুলোর নেটওয়ার্ক, পিছনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। এককথায় অপূর্ব।

এখানে সামান্য থেমে আমরা গেলাম পুরনো বাবা মন্দিরে (নতুন বাবা মন্দির ছাঙ্গু লেকের কাছে)। বাবা হরভজন সিং মাত্র ২১ বছর বয়সে মারা যান। তিনি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সিপাই ছিলেন। একবার গাধার পিঠে রেজিমেন্টের সঙ্গে তিস্তা পেরোতে গিয়ে গাধাটা হড়কে যাওয়ায় উনি জলে পড়ে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যান। তাঁর দেহ অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনেককে তিনি অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, অনেকে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে, অনেককে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মন্দির করার জন্য। তাই এই মন্দির। সেনাবাহিনীর লোকেদের মধ্যে দেখলাম বাবার প্রতি অসম্ভব বিশ্বাস আর ভক্তি।

এরপর গেলাম ভারতের শেষ গ্রাম কুপুপ (১৪০০০ ফুট)। একেবারে চিনা বর্ডারের কাছাকাছি। এখানেও ছোট্ট জনপদ, দু, চারটে দোকান, তার সবকটাতেই চিনা জিনিস পাওয়া যায়। ভালো করে ভারতের ম্যাপটা ঘেঁটে দেখলাম, সিকিম আর ভুটানের মধ্যে কুমিরের লেজের মতো চিনের যে অংশ নেমে এসেছে, কুপুপ তার খুব কাছাকাছি। অতএব সিল্করুট পাহাড় পেরিয়ে কুপুপ এর মধ্যে দিয়েই গেছে।

এখানে একটা ছোট্ট জনপদ পাহাড় দিয়ে ঘেরা আর প্রচুর সেনাবাহিনীর জওয়ান আর একটা লেক, নাম এলিফ্যান্ট লেক, দেখতে হাতির চেহারার, শুঁড় আছে। সামনের পাহাড়ের ওপাশে চিন, পাহাড়ের উপর নিশানা হিসাবে একটা সাদা থাম্পা দেখতে পাচ্ছি, ওটাই নাথুলা পাস। ডানদিকে পাহাড় পেরিয়ে গেলাম। খুবই স্পর্শকাতর এলাকা, বেশিক্ষণ থাকারও পারমিশন নেই, পেরোনো তো দূরের কথা, মিলিটারি কম্যান্ডের পারমিশন লাগবে যে।

এবার আমরা ফিরে এসেছি লুংথাং এ রাত্রিবাসের উদ্দেশ্যে। সে রাত থেকে পরদিন সকালে চান করে নুডুলস্ খেয়ে নিচের দিকে চলেছি আরিতার এ ফেরার জন্য। যত

নামছি ঠান্ডা কমছে, শ্বাসকষ্টও কমছে। সকালে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে ছিলাম পৌঁছলাম বেলা তিনটে নাগাদ।

রিসর্টে ঢোকার আগে আমরা গেলাম অ্যারিতার লেক দেখতে। লেকের আসল নাম লামপোখোরি লেক। চারিদিকের পাহাড়ের ডালে ঘন জঙ্গলে ঘেরা অ্যারিতার একমাত্র লেক। চারিদিক বাঁধানো রেলিং দিয়ে ঘেরা লেক। সবুজ জল, প্রচুর মাছ, খাবার দিলে ছুটে আসে, রাজহাঁস, বোটিং এর ব্যবস্থা— খুবই সুন্দর লেক। আমরা ছবিটবি তুলে রিসর্টে ফিরলাম। ক্লান্ত ছিলাম, দুপুরে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম।

সন্ধেবেলা সামনের লনে ক্যাম্পফায়ার, নাচাগানা আর দেশি পদ্ধতিতে রান্না করা আগুনে ঝলসানো মাংসের কাবাব। দারুণ কাটলো। রাত্রে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম।

সকালে উঠে স্নান করে ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেলা দশটায় জিনিসপত্র প্যাক করে ফেরার জন্য যাত্রা শুরু। পথে একটা খুব বড়ো গণেশ মন্দির দেখলাম, তার সামনে দেবতা আর অসুরের সমুদ্রমন্থন এর দৃশ্য প্রমাণ সাইজের মডেল দিয়ে গড়া, মধ্যে নীলকণ্ঠ শিব। ওখান থেকে এসে আমরা তিস্তার পাড়ে কিছুটা সময় কাটালাম। তারপর লাঞ্চ করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছলাম বিকেল চারটেয়।

রাত আটটায় ট্রেন, দার্জিলিং মেল। এক দল গেলো শিলিগুড়ির ফ্যান্সি মার্কেটে বাজার করতে। আমরা কজন রইলাম মালপত্রের পাহারায়। আমরা ১১ই নভেম্বর গিয়ে ১৭ই নভেম্বর সকালে কলকাতায় ফিরলাম।

এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। অত্যন্ত বাজে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে অসাধারণ প্রকৃতি আর একা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

Scanned by CamScanner

গোয়েন্দা তোজো

শুচিস্মিতা দেব

তোজোর ক্রিসমাসের ছুটি চলছে। বন্ধুরা সপরিবারে ছুটছে পাহাড়ে না হয় সমুদ্রতীরে। দু বছর ধরে তোজোরা বেড়াতে যায়না, কারণ তার দাদা জোজো। জোজোর ক্লাস টুয়েলভ, সাইন্স। সারা দিন টিউশনিতে ছুটছে। কখন যে নিজে বসে পড়ার সময় পায় কে জানে! তোজো ক্লাস ফাইভ। পরের ক্লাসেই মা বাঘের মতন ম্যাথুস স্যারকে তোজোর জন্য ফিট করবেন। তোজোর আপত্তি মানবেন না। একমাত্র রাস্তা জেঠুকে ধরা। তোজোর সব আবদার মেনে নেন জেঠু। দোতলায় থাকেন জেঠু-জেঠি। এক তলায় বাবা মা আর দাদা সহ তোজো। ভাগ্যিস জেঠু নিঃসন্তান তাই তার মনের একশো ভাগ দখল নিয়েছে তোজো। সদাহাস্যময় জেঠু যতক্ষণ বাড়িতে আছেন সকলকে মাতিয়ে রাখেন। তোজোর বেস্ট লাগে জেঠুর মজা করবার অসীম ক্ষমতা। দেখে বোঝাই যায়না যে জেঠু একজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক!

তোজোর মন খারাপের কাঁপন কিন্তু জেঠুর অ্যান্টেনায় ঠিক ধরা পড়লো। বৈজ্ঞানিকদেরও গোয়েন্দার মতন ষষ্ঠেন্দ্রিয় থাকে বোধ হয়! বললেন,—

'কী, আমার ওস্তাদের মুখ এমন ব্যাজার কেন?'

ছলছলে চোখে তোজো জানায়, 'দাদাটার জন্য রোরড হচ্ছি। বেড়াতে যাওয়া হয়না!'

জেঠু বিচলিত হন। 'তোমাকে যে দুটো "কাকাকবাবুর" অ্যাডভেঞ্চারের বই এনে দিলাম!'

'সে কবে শেষ!' জেঠু প্রমাদ গোনেন। আহা! তাঁর নয়নের মণিটির এমন নিদারুণ মনোকষ্ট! তোজোর মা ছেলেদের লেখাপড়া বিষয়ে বড্ড পিটপিটে। আর তোজোর বাবা সংসার ভুলে সেল্সের চাকরিতে বিশ্বভুবন টোটো করে বেড়াচ্ছেন! গৃহবন্দি খুদে বাচ্চাটার কথা কেউ ভাবছেই না! 'দ্যাখ তোজো, সত্যিই তো, দাদার সামনে কঠিন পরীক্ষা। ওকে ফেলে দূরে যাওয়া যায়না। তাহলে শনিবারে আমরা কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে ঘুরে আসি।'

'গ্রামে কী আছে?' বিশেষ উৎসাহী হয় না তোজো।

'কী নেই? ধানখেত, মাটির ঘর, গাছপালা, মেঠোপথ।'

'আর অ্যাডভেঞ্চার?'

'ও, অ্যাডভেঞ্চারও চাই! দ্যাখ তোজো, নতুন অভিজ্ঞতাই তো অ্যাডভেঞ্চার। গ্রাম

Scanned by CamScanner

তো দেখিসনি আগে! তাছাড়া বলা যায়না গাছের ডালে অন্ধকারে দু চারটে ভূতের স্যাম্পেল কী পাওয়া যাবেনা?'

'ভূত?' তোজোর উৎসাহের পারা চড়ে যায় হঠাৎ।

জেঠু হো হো করে হাসেন, 'চল না দেখে আসি, যা জুটবে কপালে!'

দুই গিন্নিকে রাজি করানোটা সহজ হয়না যদিও।

জেঠি বললেন, 'গ্রামে টয়লেট আছে?'

জেঠু বকে দেন, 'গ্রাম শুনেই নাক সিঁটকাও তোমরা। "স্বচ্ছ ভারতে" গ্রামে টয়লেট ব্যবহার হচ্ছে। আর তুমি যাচ্ছ নামী সাইন্টিস্ট বিক্রম সাহার বাড়িতে। গ্রামে থাকলেই লোকে গাঁইয়া হয়না!'

কথাটা সত্যি! গ্রামের মানুষ বটে বিক্রম সাহা কিন্তু বহু বছর আমেরিকার বস্টন শহরে সপরিবার তিনি জেঠুদের প্রতিবেশী ছিলেন। গ্রামঅন্ত প্রাণ বিক্রম সাত পুরুষের ভিটে ছাড়েন নি। তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর গ্রামটির নানা উন্নতি সাধনও হয়েছে।

কতদিন থেকে বিক্রম বলছে একটা উইক এন্ড ওদের বাড়িতে কাটিয়ে আসার জন্য! তোজোর জন্য হয়তো এবার সেটা সম্ভব হবে।

*****

শনিবার বিকেল। রওনা হলো তোজোরা। তোজোর বাবা দিল্লিতে, তাই বাদ। গাড়ি চালাচ্ছেন জেঠু। সামনের সিট দখল করেছে তোজো। জেঠি আর মা প্রথমে বেজার মুখে ছিলেন। ক্রমশ খোলা প্রকৃতি তাঁদের মুগ্ধ করলো। জোজোও টিউশনির ফাঁস মুক্ত হয়ে প্রসন্ন। একঘেয়ে টিভিতে কার্টুন দেখতে দেখতে বিরক্ত তোজোর সব কিছুই ভালো লাগছে আজ।

ঘণ্টাখানেক বাদে আকাশের আলো মরে এলো, ঠান্ডা বাতাসের দাপট বাড়লো। এবার তাদের গাড়ি হাইওয়ে ছেড়ে একটা সরু রাস্তায় বাঁক নিলো। গাছগুলো ঘন হয়ে দুধারে অন্ধকারের দেওয়াল তুলে দিলো। আকাশ অদৃশ্য হলো। কেমন গা ছমছমে নৈঃশব্দ। সন্দিগ্ধ জেঠি বলেন, 'রাস্তা চেনো তো তুমি? অচেনা জায়গায় দিনে দিনে এলে ভালো হতো!' জেঠু গানের সুর ভাঁজছেন, বলেন, 'একটাই তো রাস্তা, ভুল হবে কেন?'

এঁকে বেঁকে চলছে পথ। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়ি চলেছে নাচতে নাচতে। জোজো বলে, 'বাপরে! কোমর খুলে যাবে!' তোজো বিজ্ঞের গলায় বলে, 'মাটির রাস্তা দাদা, গ্রাম এমনই হয়!' বিরক্ত জেঠি বলেন, 'ল্যাম্পপোস্ট আছে, আলো কই?' জোজো তোজোর

Scanned by CamScanner

গলা নকল করে, 'গ্রাম এমনই হয়!' গাড়ির হেডলাইটের আলোই অন্ধকারকে কেটে সামনের পথটুকুকে দৃশ্যমান করছে। দু একটা আলো দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে, বাড়িই হবে হয়তো। তোজোর বুক ঢিপ ঢিপ। সত্যিই যদি জেঠুর কথা মতন দু চার পিস ভূতের উদয় হয়? হঠাৎ, সাদা মতন কিছু গাছের ডাল থেকে দশ ফুট দূরত্বে ঝুপ করে পড়লো। জেঠু খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়িটাকে থামালেন, 'এ আবার কী আপদ জুটলো?'

আপদ কিন্তু বিপদ হয়ে দেখা দিলো। সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা মনুষ্যমূর্তি রাস্তা আগলে দাঁড়ালো। 'এ কী কাণ্ড?' জেঠির আর্তনাদ। মা জোজোকে আঁকড়ে ধরেছেন। ভিতু জোজো চেঁচাতে থাকে, 'ভূ-ভূত!' তোজো বলে, 'ভূত না, মানুষ!' একটু হতাশ লাগে তার গলা। চিন্তিত জেঠু বলেন, 'ডাকাত না কি?' অতর্কিতে পাশের ঝোপ থেকে আরও একজন সাদামূর্তি ভোজবাজির মতন গাড়ির পাশে চলে আসে। এবার জেঠু হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে গাড়িকে এগোবার জন্য চেষ্টা করেন। ওরে ব্বাপ! দ্বিতীয় লোকটির হাতে পিস্তল। জেঠু ঘাবড়ে গেছেন, আবার ব্রেক চাপেন তিনি। সামনের মূর্তিটি পথ আগলে দাঁড়িয়ে। পিস্তল বাগিয়ে দ্বিতীয় মূর্তি বনেটে থাপ্পড় মারে, 'কাঁচ নামান!' জেঠু স্টার্ট বন্ধ করেন। লোকদুটির চোখ আর কপাল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। খোলা জানলা দিয়ে পিস্তলটা জেঠুর মাথা তাক করে এগিয়ে আসে।

'বহুৎ সাহস! রেতের বেলা বউ পোলাপান নিয়া যাচ্ছেন ডাকাতে কালীবাড়ির পথে। হারগুলান খুলে দ্যান চটপট!' জেঠুর মুখ বিবর্ণ। পিস্তলটা জেঠুর মাথার ঠিক পিছনে। যদি চালায়, জেঠুর ঘিলু উড়ে যাবে।

তোজোর চোখ শুধু ওই পিস্তলটাই দেখতে পায়, হঠাৎ কী যে হয়! তোজো সপ্ করে হাত বাড়িয়ে কাড়তে যায় পিস্তলটা। এত আতর্কিতে ঘটে যে ডাকাতটার হাত থেকে অনায়াসে পিস্তলটা চলে আসে তোজোর হাতে। ডাকাতটা তোজোর দিক থেকে কোনো প্রতিরোধের আশংকাই করেনি, হয়তো একটু অসাবধানই ছিল সে। বোকার মতন চেয়ে থাকে সে। তোজোও কম অবাক হয়না।, 'আরে জেঠু! এটা তো খেলার পিস্তল।'

জেঠু এবার দ্রুত গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কাঁচ তুলে দেন। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ পড়ে। ভোম্বলের মতো ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে ডাকাতদ্বয়।

পাঁচ মিনিট সবাই চুপ। স্তম্ভিত বসে। তারপর জেঠু বলেন, 'ওস্তাদ, তুতো হিরো নিকলা বেটা!' এবার ঘর বাড়ি দেখা যায় দুটো একটা করে; জেঠু স্পিড কমান। তোজো পিস্তলটা দেখে ঘুরিয়ে, 'আমার তো হুবহু এমন একটা পিস্তল আছে, তাই তো বুঝে গেলাম।' জেঠি উত্তেজিত, 'যদি সত্যি হতো? ওভাবে কেড়ে নেবার সাহস হলো কী করে?'

Scanned by CamScanner

'বা রে, লোকটা যদি জেঠুকে মেরে দিতো?'

জেঠু খুশি, 'দেখছো, আমায় কত ভালোবাসে, ডাকাতদেরও ভয় পায়না!'

ওরা সবাই এখন নানা কথায় সরব হয়। 'আমরা এসে গেছি!' জেঠু এবার ঘোষণা করেন।

*****

বিক্রম সাহার একতলা বাংলো বাড়ি। ঝকঝেকে আলো, অনেক জায়গা জমি নিয়ে বাংলোটা। ওরা অপেক্ষাতেই ছিলেন। গাড়ির শব্দে হৈ হৈ করে বাইরে আসেন।

'সব ঠিকঠাক তো দাদা?' বিক্রমকাকুর প্রশ্নে জেঠু বলেন, 'বিরাট ফাঁড়া গেলো। গেঁয়ো ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলাম।'

'সেকি?'

'না, না, কিছু করতে পারেনি। কেন জানো? আমাদের তোজো ডাকাতের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছে। পিস্তলটা আবার নকল!'

বিক্রমকাকুর স্ত্রী সবিতাকাকি তো অবাক, 'ডাকাত? আমাদের এখানে ডাকাতির কথা শুনিনি কখনও।'

প্রাথমিক শক্ কেটে যাওয়ায় তোজোর এখন নিজেকে বেশ হিরো লাগছে। তার জন্য ডাকাতরা পিছু হটলো, এটা কম?

*****

সকালে উঠতে একটু বেলা হলো তোজোর। কাল অনেক রাত অবধি গল্প চলেছে। বিক্রমকাকুর মেয়ে রুণা, ক্লাস এইটে পড়ে। খুব ভাব হয়ে গেছে। সে ভালো ভূতের গল্প বলে। একবার পিছনের পুকুরপাড়ে কলাগাছকে ভূত ভেবে বিক্রমকাকু নাকি বেজায় ভয় পেয়েছিলেন, সেই গল্প বললো রাতে রসিয়ে রসিয়ে। সকালের আলোয় বাড়ির বাইরে ফুল আর ফলের বাগান দেখে তোজো তাজ্জব। আকাশটা ঘন নীল। টাটকা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নেয় তোজো। তোজো আর রুণা ফুলগাছ দেখছিল।

'এখানের বাতাসে দূষণ কম।' জোজোর কথায় রুণা উছলে উঠলো, 'ব্রেকফাস্ট খেয়ে ধানখেতে যাব, তারপর মটরশুঁটির খেতে বসে মটর ছাড়িয়ে খাবো।'

সে বেশ মজা হবে, ভাবে তোজো। রুণা এবার গলা তোলে, 'বংশী, মায়ের পুজোর ফুল তুলেছো?'

পাশের সবজিক্ষেতে উবু হয়ে বসে থাকো লোকটি উঠে আসে, হাতে এক সাজি ফুল ও ফুটফুটে সাদা একটা ফুলকপি।

Scanned by CamScanner

'এই ন্যান লিলিমনি।' গলাটা শুনে তোজো চমকে তাকায়। ঢ্যাঙা বংশী এ বাড়ির মালি। এর গলাটা এত চেনা লাগে কেন? আর দুই ভুরুর মাঝখানের বড়ো জড়ুলটা, ওটাও দেখা লাগছে তোজোর। এরপর বিদ্যুৎচমকের মতন তোজোর মনে ডাকাতির দৃশ্যটা চমকে ওঠে। এই তো সেই পিস্তল হাতে লোকটা। এরকম বাজখাঁই গম্ভীর গলাই ছিল তারও। লাফিয়ে তোজো ছুট মারে। ড্রইংরুমে আড্ডা মারছে বড়োরা। বুলেটের মতন জোজোকে ছিটকে আসতে দেখে জেঠু বলেন, 'কী রে?'

দু চোখে দারুণ আতঙ্ক তোজোর। 'সেই ডাকাতটা জেঠু!'

'ডাকাত?'

'ওই যে বংশী, ও-ও-ওই ডাকাত!'

'অ্যাঁ?' জেঠি ডুকরে ওঠেন, 'ছেলেটা ডাকাত ডাকাত করে পাগল হয়ে গেলো গো!'

'অন গড! জড়ুলটা আমি দেখেছিলাম, ওইরকম ঢ্যাঙা আর গলাটাও—

এবার জেঠু বলেন, 'বাপরে! কী ছেলে গো!'

তারপর বিক্রমকাকুর দিকে চেয়ে বলেন, 'তবে এবার যবনিকা তোলা যাক।' চোখে চোখে কথা হয় দুজনের। জেঠু বলেন,'সত্যিই বলি। তোজোকে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেবার জন্য ফল্স ডাকাতির প্ল্যান কষি আমি ও বিক্রম। বংশী আর গোয়ালা বিশু, এরা ডাকাত সাজে। পিস্তলটা তোজোরই, আমিই এদের সাপ্লাই দিই। ওই কারণেই তোজো ওটা হাতে নিয়েই হয়তো বুঝে যায় ওটি খেলনার পিস্তল। দুই গিন্নিকে নকল সোনার হার পরতে বলি। কথা ছিল তোমাদের হার আর আমার ঘড়ি নিয়ে ওরা চম্পট দেবে।'

বিক্রমকাকু মাথা নাড়েন,— 'প্ল্যান তো ছিল আপনাদের পৌঁছনোর পর দুই ডাকাত নিজ হাতে মাল ফেরত দিয়ে যাবে। কিন্তু পুরো প্ল্যান বাঞ্চাল হলো তোজোবাবুর বীরত্বে। পিস্তল ছিনিয়ে নিলো, এবার তো বংশীকেও ধরে ফেললো।'

'কার ভাই গো বলো? ওকে তাক লাগাতে গেলাম উল্টে তোজোই আমাদের বোকা বানিয়ে দিলো।

জেঠি মায়ের হাত ধরে ছুটলেন, 'চল তো, ডাকাতটাকে দেখে আসি।' আর তোজো? সে তার পিস্তলটা টেবিলের উপর থেকে ধাঁ করে তুলে জেঠুর দিকে তাক করে, 'ফ্রিজ'। ঠকানোর জন্য ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!' দুই বন্ধু মাথার উপর হাত তোলেন, 'উই সারেন্ডার, গোয়েন্দা তোজো!'

মিসেস সাহা এক ট্রে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে বলেন, 'ওরে বাবা, এ কী কাণ্ড।'

Scanned by CamScanner

অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

সুকমল ঘোষ

৩০ অক্টোবরের সংবাদপত্রের একটা শিরোনামের দিকে আমার দৃষ্টি গেলো,—

'মাঠের ভেতর সেরা ইংল্যান্ড আর বাইরে ভারত'।

একথা নিশ্চয়ই সত্য যে ২৩ দিনের ফুটবল যজ্ঞ, বোম্বাই, কলকাতা, গুয়াহাটিতে চলেছিল তা ফুটবলপ্রেমীরা যেভাবে স্বচ্ছন্দে উপভোগ করতে পারলেন তার জন্য উদ্যোক্তা দেশ হিসেবে ভারত অবশ্যই কৃতিত্বের অধিকারী।

ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো আমাদের প্রিয় শহর কলকাতাকে ফুটবলের শহর বলে চিহ্নিত ক'রে আমাদের গর্বিত করে গেলেন।

ডার্বি ফুটবলের শহর কলকাতায় খুব ছোটো বয়স থেকেই ফুটবল নিয়ে উন্মাদনায় আমরা জড়িয়ে পড়েছি। লাইন দিয়ে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ম্যাচ দেখতে গিয়ে ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়েছি। একটা গান তো সবার মুখে মুখে ফেরে, 'সব সেরার খেলা, বাঙালির তুমি ফুটবল'।

এশিয়াডে আমরা একবার সোনা জিতেছি কিন্তু ফুটবলের 'আন্তর্জাতিক আসরে আমরা প্রবেশই করতে পারিনি।

এর কারণ একটাই—তা হলো ফুটবলে আমরা পেশাদারিত্ব চালু করতে পারিনি।

সেদিক থেকে আই এস এল একটি সদর্থক পদক্ষেপ নিশ্চয় কিন্তু সেখানেও বিপদ আছে। বিপদটা হলো, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা স্থানীয় স্তরে সাফল্য ও অর্থ পেয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের ফুটবলের জন্য নিজেদের তৈরি করবার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। কারণ একটাই—তা হলো 'ঘরেতে অভাব পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া'। সরকারই এই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারেন। তাঁরা অনূর্ধ্ব ১৭ দলের জন্য একটা ফুটবল আকাদেমি তৈরি করে দিতে পারেন।

সেখানে দিকশন, অমরজিৎ সিং, অভিজিৎ সরকারের মতো সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের পাঁচ বছরের জন্য মাস মায়নায় নিযুক্ত করা হোক। এই পাঁচ বছরের জন্য তাঁরা বাইরের কোনো দলে খেলতে পারবেন না। দরকার হলে তাঁদের বিদেশে ট্রেনিং করিয়ে আনা হোক।

এবার চোখ ফেরাই এবারের অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের দিকে। আয়োজক দেশ ভারতের, এই টুর্নামেন্টে সেরা ম্যাচ ছিল কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ১-২ গোলে

Scanned by CamScanner

ভারত হারে। এই ম্যাচ দেখে আমরা ভেবেছিলাম পরবর্তী ঘানা ম্যাচে ভারত সাংঘাতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াবে কিন্তু ব্যাপারটা অতোটা সহজ ছিলনা।

শারীরিক সক্ষমতা ও কৌশলে ঘানা দল ভারতের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। বিশ্বফুটবলের শক্তিশালী দলগুলির সঙ্গে ভারতের যে বেশ খানিকটা ব্যবধান রয়েছে তা ভারতের কোচ ম্যাটোম স্বীকারও করে নিয়েছেন।

কিন্তু ফিফা সভাপতি ইনফানতিনো বলেছেন এই ব্যবধান খুব বেশি নয়।

এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত দিতে পারবেন ক্রীড়া বিশেযজ্ঞরা।

তা আমরা জানলেও একথা আমি বলবো কোনো নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে এগোলে কখনোই কোনো সাফল্য আসতে পারেনা। আমাদের দেশের ক্রীড়া মন্ত্রককে ক্রীড়া বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ইংলন্ড এই প্রথম অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ জিতলো। ইংল্যান্ডের রিহান ব্রুস্টার প্রতিযোগিতায় আটটি গোল করে। সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে গোল্ডেন বুট পেয়েছে।

সে দুটি হ্যাট্রিক করে প্রায় একক চেষ্টায় আমেরিকা ও ব্রাজিলকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিয়েছে। ফাইনাল খেলায় দুটি গোল করে ফিলিপ ফোডেন পেয়েছে গোল্ডেন বল।

এই সব প্রতিভা আবিষ্কৃত হওয়া এবারকার প্রতিযোগিতায় মস্ত বড়ো প্রাপ্তি।

স্পেন ও ইংল্যান্ডের ফাইনাল খেলায় ইংল্যান্ড যেভাবে দু'গোলে পিছিয়ে পড়েছিল তাতে অনেকেই ভেবেছিলেন স্পেনের ভাগ্যে এবার কাপ নিশ্চিত কিন্তু ইংল্যান্ড চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে অ্যাটাকিং ফুটবলের যে নমুনা রাখলো তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

ইংলন্ডের কোচ স্টিভ কুপারকে যখন সকলে প্রশংসা করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন—আমাকে প্রশংসা না করে সেই সব আকাদেমির অনামী ফুটবল প্রশিক্ষকদের আপনারা প্রশংসা করুন যাঁদের হাত দিয়ে এই টিমের ছেলেরা উঠে এসেছে তাঁদের।

প্রথম থেকেই স্পেনের ডিফেন্সের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। ফাইনালে এই দুর্বলতাই তাদের কাল হলো।

পাঁচ পাঁচটি গোল তাঁদের হজম করতে হয়েছে। ফুটবলের মক্কা ব্রাজিল দেশ, এবারের প্রতিযোগিতায় একেবারেই ম্লান ছিল। কলকাতার ব্রাজিল সমর্থকরা তাদের খেলা দেখে

Scanned by CamScanner

খুবই আশাহত হয়েছে। পাওলিনহো, অ্যালানরা এদেশের ফুটবল সুনাম তেমনভাবে রক্ষা করতে পারলো না। শুধু কোয়ার্টার ফাইনাল নয় তৃতীয় স্থান নির্ণয়কারী খেলায়ও তারা তেমন সুবিধে করতে পারেনি।

ব্রাজিলের অ্যালানের নেওয়া দুর্বল শট গোল রক্ষক কোইটা পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে না দিলে, খেলার গতি কোন দিকে ঘুরতো তা বলা মুশকিল।

ব্রাজিলের কোচ বলেছেন, দল এবারকার প্রতিযোগিতার হার থেকে শিক্ষা নেবে।

এটাই প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আমাদের সত্য।

শুধুমাত্র পার্সিং ফুটবলে সাফল্য আসেনা, সেই সঙ্গে থাকা চাই গতিবেগ ও ফিনিশ এবং অবশ্যই শারীরিক সক্ষমতা। উদ্ভাসের খুদে ফুটবলার বন্ধুরা, তোমরা এবারকার অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের একটা দিশা পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ফুটবলে সাফল্য পেতে গেলে গতিবেগ, দম এবং শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর ট্রেনিং তোমাদের নিতে হবে। কোনো ক্লাব বা কোচিং সেন্টারে থাকলে ফুটবলের অনেক সুবিধা তোমরা পেতে পারো।

শব্দ বাক্সের উত্তর

পাশাপাশি: ১) শবর (৪) পারদ (৬) কলমা (৭) ঠগ (৮) লয় (৯) বাক (১১) ধান (১২) তিথি (১৩) রকম (১৫) শ্রমিক (১৬) তমসা (১৭) মর (১৮) নল (১৯) রণ

ওপর-নিচ: ১) শকল (২) বলয় (৩) রমা (৪) পাঠক (৫) রগ (৯) বান (১০) পথিক (১১) ধামসা (১২) তিমির (১৩) রতন (১৪) কমল (১৫) শ্রমণ

Scanned by CamScanner

সেবারের দোলের দিনটা

কাবেরী ঠাকুর

প্রতি বছর দোলযাত্রার আগের রাতটা যখন আসে, তখন সেদিনের সেই আতঙ্কটা আজও আমায় চেপে ধরে—এতগুলো বছর কেটে যাওয়ার পরও। আগে আগেও এ রকমটা হতো, তবে রাধা আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়ে যখন ঢুকলো তখন থেকেই দোলের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আতঙ্কটা যেন আমার পিছু নেয় আরও বেশি করে। অনেক ভেবে চিন্তে এর একটা কারণ আমি আবিষ্কার করেছি। রাধার কাছেই শুনেছি, সেদিনের সেই ঘটনার মূল দায়টা ছিল তার মায়ের—এ কথা সে জেনেছে অনেক বড়ো হয়ে। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন তার বয়েস ছিল মাত্র আড়াই।

কয়েক বাড়ি রাঁধুনির কাজ করলেও, রাধা কিন্তু বেশ স্মার্ট। লেখাপড়া করেছে খুবই সামান্য কিন্তু জীবনে নানা সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে খুব ছেলেবেলা থেকেই। নিজের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার জোরেই সে একটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে—সবচেয়ে বড়ো কথা, তার একটা ন্যায় অন্যায় বোধ আছে যা বেশির ভাগ শিক্ষিত লোকেরও থাকে না।

এই সেদিনও ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো সেই ঘটনাটা নিয়ে। আমি তখন ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়ি। এখন আমাদের বাড়ির পাশে পরপর তিনটে চারটে তিনতলা বাড়ি, তারপর লম্বা লোহার রেলিং, রেলিঙের পরেই রয়েছে রেলের লাইন। তখন কিন্তু ছবিটা এরকম ছিল না। আমাদের বাড়িটাই ছিল শেষ বাড়ি—তারপর পুরোটাই ফাঁকা, আর তারপর শুরু হয়েছে রেলের লাইন। পাড়ায় তখন বাড়ির সংখ্যা অনেক কম। রেললাইন ধরে এখন যে থিকথিকে বস্তি, তখন তার শুধু পত্তন মাত্র হয়েছে। হতদরিদ্র মানুষজন আস্তে আস্তে খড়ের চালের ঘর তুলছে কোনও রকমে, সে সব ঘরে মাথা নিচু না করে ঢোকাই যায় না। এই সব লোকেদের জীবিকা বলতে, মহিলারা বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে খুবই কম মাইনেতে। কেননা মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থার রমরমা তখন ছিল না। বাড়ির পুরুষেরা কেউ রাজমিস্ত্রি, কিংবা নাপিত আর না হয় বাড়িবাড়ি জল দেয়। অনেকেই অবশ্য আবার নিষ্কর্মা—বউয়েদের রোজগারে খায় আর তাস খেলে। সে যাই হোক, তাদেরও আমরা পাড়ার লোক বলেই জানি।

এই রেলের লাইনটা ছেলেবেলা থেকেই আমাকে ভীষণভাবে টানে। খুব ছেলেবেলায় জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতাম—কয়লার ট্রেন। অবশ্য বড়োরা কেউ আমাকে

এ অবস্থায় দেখতে পেলেই খুব বকুনি দিতেন—গ্রিলের ওপর দাঁড়ালে গ্রিল বেঁকে যাবে তো! এতবার বলি, তবু কথা শোনো না কেন? অতএব তখন ছুটে যেতে হতো ছাদে।

ছাদে দাঁড়ালে একটু দূরে স্টেশনটাও দেখা যেতো। ইঞ্জিনের চিমনি দিয়ে কুন্ডলী পাকানো মোটা ধোঁওয়া আকাশটাকে নিমেষে কালো করে দিতো। ট্রেনের বাঁশি, গার্ডের পতাকা নাড়ানো, ড্রাইভারের গাড়ি চালানো এ সব কিছু ছাপিয়ে আমার চোখ দুটো পড়ে থাকতো গাড়ির স্টোকারের দিকে। ইংরিজিতে স্টোকার বলা হয় সেই লোকটাকে যে ইঞ্জিনের উনুনে কয়লার বড়ো বড়ো টুকরো অনবরত জোগান দিয়ে যেতো। মাথায় টুপি, চোখে মোটা কালো চশমা, হাতে দস্তানা, নীল রঙের রেলের দেওয়া শার্ট প্যান্ট পরা একটা লোক বেলচা করে জ্বলন্ত গনগনে আগুনে বড়ো বড়ো কয়লার টুকরো ফেলেই চলতো। তার চেহারাটা সামনের দিক থেকে কখনও দেখতে পাইনি। তাই তাকে আরও রহস্যময় মনে হতো। যন্ত্রের মতো সে কাজ করে যেতো কোনও দিকে না তাকিয়ে।

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রেন যায় বলে, বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের কাছে আমাদের যেন একটা আলাদা খাতির ছিল। আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলে ছোটোরা সরাসরি ছাদে চলে যেতো। আমরা রোজ ট্রেন দেখি বলে মনে মনে তারা আমাদের হিংসেও করতো। একবার হলো কি, ভোরবেলার প্রথম ট্রেনটা যেতে যেতে হঠাৎ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘুম থেকে উঠে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে, নড়েও না চড়েও না, ট্রেনের লোকজন সব অস্থিরভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। খবর নিয়ে জানা গেলো সেদিন 'হরতাল' বলে ট্রেনটাকে আটকে দিয়েছে, যেতে দিচ্ছে না। তখন 'বন্ধ' 'অবরোধ' এই সব কথা চালু হয়নি। কোনও একটি কারণে হরতাল ডাকা হয়েছিল। সেটা কী কারণ তা যতদূর পারা যায় সহজ করে আমাদের বলা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আজ আর আমার তা মনে নেই। তবে একটা ঘটনা খুব মনে আছে। যখন আমরা ছোটোরা ভেবে মরছি ট্রেনে আটকে পড়া লোকগুলো তাহলে না খেয়ে থাকবে, বাড়ি ফিরবেই বা কী করে, তখন আমার মা হঠাৎ আকুল হয়ে বলে উঠলেন—ওমা, ঐ তো আমাদের পাশের বাড়ির ভুপে!

ভুপেমামার বাড়ি আমার মামার বাড়ির ঠিক পাশেরটাই। ভুপেমামা ছিল একজন নর্তক, মানে রীতিমতো নাচের অনুষ্ঠান করা লোক। ভুপেমামার নাচ আমরা কখনও দেখিনি। তবে জানলার ফাঁক দিয়ে তাদের বাড়িতে নাচের সঙ্গে বাজনোর বড়ো বড়ো বাদ্যযন্ত্র অনেক দেখেছি। ফরসা রঙ, বাবরি চুল, মাঝারি গড়নের ভুপেমামার সঙ্গে কথা বলে

Scanned by CamScanner

কখনওই মনে হয়নি তার নাচের দল আছে। সেদিন আটকে পড়া ট্রেনটাতে তার নাচের দলের লোকজনই ছিল—আগের দিন রাতে অনুষ্ঠান সেরে ফিরছিল তারা।

বাবা আর কী করে! শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক বলে কথা। একটা বড়ো কেটলিতে চা করে দিলো মা। স্থানীয় মিষ্টির দোকান থেকে ভাঁড় জোগাড় হলো। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর মিষ্টি দিয়ে আসা হলো ভুপেমামাদের। আমরা তো খুবই রোমাঞ্চিত। আশা ছিল ভুপেমামা অন্তত একবার এসে আমাদের বাড়ি দেখে যাবে। সেটা অবশ্য হয়নি। তারপর এক সময় ছাড়া পেয়ে ট্রেনটা কখন চলে গেলো তা টেরও পেলাম না।

সেদিন রাতেই ঘটনাটা ঘটলো। চাঁচর বা নেড়াপোড়া যাই বলা হোক না কেন, বস্তির লোকজন তা বেশ ধুমধাম করেই তা পালন করলো। আকাশে বড়ো চাঁদ উঠেছে। দক্ষিণ দিক থেকে বইছে মিষ্টি হাওয়া। পরের দিন দোল। ফাগ আর আবীর কেনা হয়ে গ্যাছে। পুরনো জামাও বের করে রাখা হয়েছে। সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেছি, পরদিন সকাল সকাল উঠতে হবে।

রাত তখন কত হবে—দেড়টা দুটো। বিশাল একটা চেঁচামেচি শুনে পাড়ার লোকজন সবার ঘুম গেলো ভেঙে। আমাদের একতলার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে আগুনের হলকা ঢুকছে। আগুন, আগুন—ভয়মেশানো আর্ত চিৎকারে সারা পাড়া কেঁপে উঠছে। কী সাংঘাতিক সেই দৃশ্য! যাকে বলে লেলিহান শিখা, আগুনের লেলিহান শিখায় রাতের আকাশটা লাল। রেললাইনের বস্তি পুড়ছে দাউদাউ করে। বস্তি থেকে লোকজন বাচ্চাদের কোলে কাঁখে করে প্রাণ নিয়ে ছুটছে। বৃদ্ধদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। আগুন থেকে বাঁচবার জন্যে সেকি প্রাণপণ চেষ্টা। আমরা ভয়ে 'থ' হয়ে গেছি। পাড়ায় তখন কারুর বাড়িতেই টেলিফোন নেই। আমাদের বাড়ির জল খুলে দেওয়া হয়েছে। আশপাশের টিউবওয়েল থেকে বালতি বালতি জল ঢালা হচ্ছে। কিন্তু আগুনের রোষ থামার কোনও লক্ষণ নেই। ওরই মধ্যে কেউ একজন বুদ্ধি করে থানায় খবর দিয়েছিল। দমকলের গাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে যখন এলো ততক্ষণে সব শেষ।

কিন্তু দমকল তো তাদের কাজ করবে। সাদা সাদা হোসপাইপ পেতে কীভাবে চটপট যন্ত্রের মতো তারা কাজ করতে লাগলো তা দেখেই আমরা অভিভূত। শুধু অভিভূতই নয়। ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনার কাঁপন টের পাচ্ছি। কী হয়, কী হয়!

দমকলের অফিসার খাতাপত্রে রিপোর্ট লেখার কাজ সারতে আমাদের বারান্দাতেই বসলেন। আগুন নিভেছে আপনা থেকেই কেননা পোড়ানোর মতন কিছুই আর পড়ে

Scanned by CamScanner

নেই। আগুনের সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে জানা গেলো না। তবে কোনও একটি বস্তিঘরে জ্বালানো কুপি থেকেই এই বিপত্তি বলে অনুমান করা হলো।

সে রাতে কারুর চোখে ঘুম আসেনি। ডুকরে ডুকরে কান্না, আর বাচ্চাদের চিৎকারে রাতের নীরবতা খানখান হয়ে গেলো। পরদিন ভোর না হতেই, পাড়ার লোকজন সব নেমে পড়লো ত্রাণের জিনিস জোগাড় করতে। কাউকে কিছু বলতে হলো না। লোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এলো সব। বড়োবড়ো হাঁড়ি ভাড়া করা হলো ডেকরেটরের দোকান থেকে। তাতে খিচুড়ি চড়ানো হলো। দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না। সেদিন পাড়ায় কেউ দোল খেললো না। দোল খেলার কথা কারুর মনেও হয়নি। এ যেন এক বিরাট শোকের দিন।

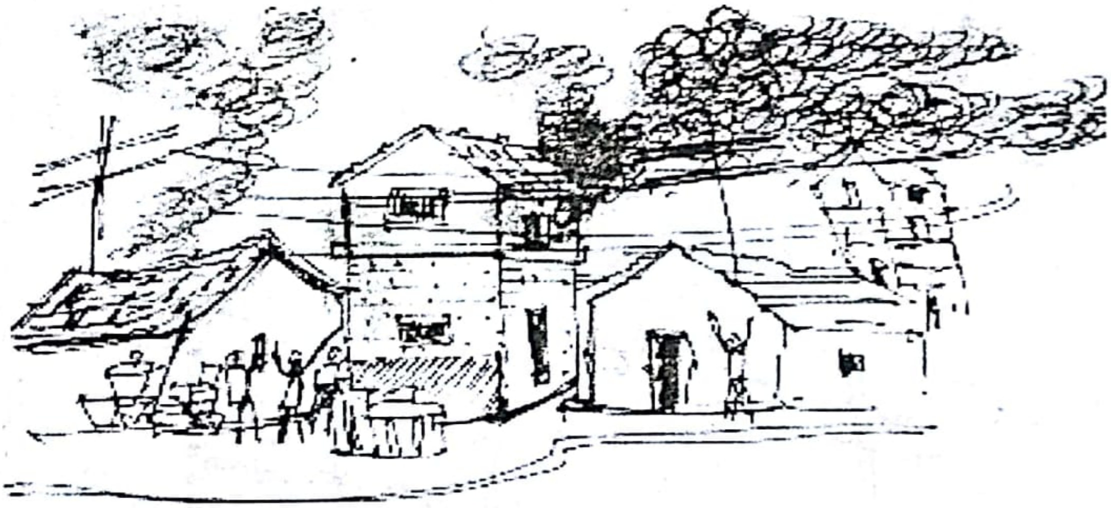

আস্তে আস্তে অবশ্য জীবন নিজের ছন্দে ফিরলো। কিন্তু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে রেখে গেলো চিরদিনের এক স্মৃতি। রাধা বলছিল—আমার জানো তো কিছুই মনে নেই। তবে মার কাছে শুনেছি, মা ভয়ে চিৎকার করছিল—আর কোনও মতে আমাকে জাপটে ধরে আগুন পেরিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমার গায়ে একটা আঁচ শুদ্ধু লাগেনি।

আমি জানতে চেয়েছিলাম—ব্যাপারটা আসলে কীভাবে হয়েছিল শুনেছিলে কিছু?

—হ্যাঁ গো, মায়ের কাছেই বড়ো হয়ে শুনেছি। মা একটা কুপি জ্বালিয়ে শুয়েছিল আমাকে পাশে নিয়ে। তারপর হঠাৎ কাপড়ে আগুন ধরে যায়। রাতের বেলা বলে কাপড়টা

Scanned by CamScanner

সেখানে ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসেছিল। তারপর সেই শাড়ি থেকেই আস্তে আস্তে আগুন সারা বস্তিতে ছড়ালো।

—সে কি? —আমি আঁতকে উঠি।

—হ্যাঁ গো, আসল ঘটনাটা হলো তাই। এই ঘটনার পর মা তো পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল। সেই যে সেই ভোরের প্রথম ট্রেনে আমাকে নিয়ে পালালো, পুরো এক বছর লুকিয়েছিল দেশে এক আত্মীয় বাড়িতে। তারপর সব কিছু মিটে যেতে, আবার এলো এখানে। মাকে মাথার চিকিৎসাও করাতে হয়েছিল।

রান্না সেরে রাধা গ্যাস স্টোভের চাবিটা বন্ধ করলো। আমি বললাম— সেই ভুল আবার করলে তো! আগে তো সিলিন্ডারটা বন্ধ করো। তারপর স্টোভের চাবি। ভুল করে সিলিন্ডার খোলা রাখলেই তো গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে। এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো আমাদের নজরে থাকে না বলেই না এতো বিপদ ঘটে যায়।

রাধা লজ্জা পেলো। বললো—ওমা তাই বুঝি। ঠিক মনে রাখবো এবার থেকে।

Scanned by CamScanner

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে,
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে
কে বাঁচাবে দুর্বলেরে।
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে
লবে ডেকে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্ভাসের পক্ষে ৯৫, নন্দীবাগান (সেন গার্ডেন) কলকাতা-৭০০ ০৭৮ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণ ব্যবস্থায়:সঞ্জীব প্রকাশন কলকাতা-৯ মুদ্রণে গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন কলকাতা - ৯;

দাম : দশ টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner